

জোনাকির আলো

মিহির আচার্য



ক্লাসিক প্রেস ঃ কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ

ফাল্গুন, ১৩৬৪

প্রকাশক

নারায়ণ সেনগুপ্ত

৩।১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ রূপায়ণ

গণেশ বসু

মুদ্রণ

শশী প্রেস

৪৫, মসজিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

দাম দু' টাকা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

অগ্রজপ্রতিমেষু



উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে যদি আমার উদ্দেশ্য পরিবেশিত না হয়ে থাকে তাহলে ভূমিকা করে' সে-ত্রুটির সংশোধন করা যাবে না। এককালে জীবন-ধারণ নামক বস্তুটির চাহিদা মেটাতে গিয়ে জীবিকার যে সব ঘাটে-অঘাটে তরী ভেড়াতে হয়েছে, আজ লিখতে গিয়ে সেই সব দেখাশোনা মানুষগুলিরই মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। আমার উপন্যাসের যদি কিছু মূল্য থাকে তা ওইসব বিচিত্র নরনারীদেরই মূল্য—আমার নয়। অবশ্য এর থেকে কেউ যদি মনে করেন নিছক বাস্তবকেই আমি প্রতিবিম্বিত করেছি তাহলে ভুল হবে, কারণ সাহিত্যের প্রয়োজনেই বাস্তবকে অনুরঞ্জিত করবার শৈল্পিক স্বাধীনতা আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে।

যাঁদের সহৃদয় আনুকূল্যে এই উপন্যাস-প্রকাশ ত্বরান্বিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে সুহৃদ্‌বর ক্ষিতীশ সরকার এবং প্রকাশকের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা স্থায়ী হয়ে রইল।

দুপুরের রোদ বিকেলের দেয়ালে আছাড় খেতে-না-খেতে অদূরে গলিতে স্টুডিয়োর গাড়িটার হর্ণের শব্দ শোনা গেল। চিৎপুরের ট্রাম লাইন থেকে দূরে, গলির সর্পিল চংক্রমণ এড়িয়ে, প্রাচীন আমলের কতগুলো ভাঙাচোরা বাড়ি ছাড়িয়ে, যেখানে গলির পথটা চাপা হয়ে সমস্ত আবহাওয়াকে জাঁতি-কলে চাপা ইঁদুরের মতো দম আটকে মেরেছে—সেখানে ছয় ঘরের ছ'জন প্রাণী—রং চটা স্যুটকেশের মতো বিবর্ণ, ফ্যাকাশে, নামহীন, গোত্রহীন। সারিসারি টিনের খুপরি, মাটির দেয়ালে পাঙাশে হয়ে যাওয়া চুণের ছোপ, মাঝখানে একফালি উঠোন, যদি কারুর কোনোদিন ঘুম না আসা চোখে পশ্চিম কোণ ঘেঁসে কলের ধারটায় শুকনো সজনে গাছটার ফাঁকে চাঁদ দেখার ইচ্ছে হয়—কাঁচা পায়খানার উৎকট গন্ধে পচা জলকাদা উদ্ভিদের বুনো ঝাঁজে আর অস্পষ্ট চাঁদের কুহেলিতে চোখের পাতায় স্বপ্ন ঝরে··· যে স্বপ্ন একদিন সবাই ছাখে···গোবরজলে তকতকে নিকানো উঠোন, উঠোনের মাঝখানে তুলসী-মঞ্চ···সন্ধ্যার প্রদীপের শিখা কুমারীর প্রণয় ভীরু লজ্জার মতোই কম্পমান···এই উঠোনের বুকেই কলাগাছ পুঁতে ছাঁদনাতলা—দিদির বর এল পাল্কী চড়ে' এই ছাঁদনাতলায়, শাঁখ বাজল, সধবারা উলু দিল··· তারপর স্বপ্ন ভেঙে যায়, ছাঁদনাতলার মাটি চোখের লোনা জলে ভবে যায়··· স্বপ্ন প্রথম-প্রথম অনেকেই ছাখে—যাদের সিঁথেয় সিঁদুর চড়েনি, যারা সিঁদুর তুলে দিল, শাঁখা আব নোয়া কলতলার কাদায় বিলীন হ'য়ে গেছে যাদের।

অতীত সকলেরই আছে, ম্যালেরিয়া আর কালাজ্বরেব কাঁথায় মুড়ি দিয়ে কখনো-সখনো কাঁথার ছু'একটা সেলাইয়ের ফোঁড়েব মতো পেছনের দিনগুলো উঁকি দিয়ে ওঠে, অসুখ সারে আবার, অতীত হাতড়ানো রোগটাও সেরে আসে, বাস্তবটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

ইস্কুলের মেয়েদের মতো পিঠের ওপব বিনুনি দুলিয়ে, ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে হাল্‌কা কচি কলাপাতা শাড়িটা অঙ্গে জড়িয়ে আদুরে গলায় বলত মেনকা, 'আমরা তো আর পাড়ার মেয়েদের মতো সরকারী খাতায় নাম লেখাই নি। আমরা হলুম গিয়ে জোনাকি, আমরা সাঁঝসকালে মিটমিট করে' না

জলসে তারকাদের ডেকে আনবে কে?' বছর উনিশ কুড়ি। মুখপুড়ী মেয়েটার সারাক্ষণই হাসি। বক ঝক, গাল দাও, মারো, তবু হাসছে সে। মাথা ভর্তি চুলের বোঝা. সাজলে-গুজলে লিকলিকে হাত আর কণ্ঠার বেমানান অংশগুলো হঠাৎ চোখে পড়ে না।

ছবি জিগ্যেস করেছিল: 'আচ্ছা, তুই এই লাইনে এলি কী করে?'

উত্তরে ছবির চিবুক নেড়ে দিয়েছিল মেনকা, ভেঙচি কেটে বলেছিল: 'এ লাইনে এলি কী করে!' যেন এই লাইন ছাড়া অন্য লাইনে যাওয়া সম্ভব ছিল! আমি এ' লাইনে আসব বলেই তো আমার মা-বাবা জন্মাবার সংগেই আমার নাম রেখেছিল মেনকা...' বলেই খিলখিল করে' হেসে উঠেছিল মেয়েটা।

আর হাসির চোটে ঘুম ভেঙে পাশ ফিরে শুয়ে বিরক্ত গলায় ঝংকার দিয়ে উঠেছিল শোভা: 'মরণ আর কী!'

মেনকা হঠাৎ হাঁটু গেড়ে শোভার পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ফিসফিস করে' জিগ্যেস করেছিল: 'কী মাসি পেটের দানোটা খুব লাফাচ্ছে? পেটে হাত বুলিয়ে দেবো—'

শোভা কোঁকাতে কোঁকাতে শাপান্ত করেছিল: 'অত তেজ থাকবে না বাছা। যত হাসি তত কান্না—সেদিন বুঝবি...'

'তুমি রাগ করছ তবে থাক।' মেনকা উঠে গিয়েছিল।

ছবি আবার জিগ্যেস করেছিল: 'আচ্ছা বললিনে তো—নাগরটা কে?'

'নাগর!' হেসেছিল মেনকা: 'আমায় জামাইবাবু। প্রথম বাচ্চা বিয়োবার পরই দিদি জন্মের মতো শয্যাশায়ী হল গ্রহণী রোগে। অথচ, জামাইবাবুর সংগে শোবে কে? বুঝতেই পারছিস।' মুখ টিপে হাসল মেনকা।

ছবি বিস্মিত গলায় বলেছিল: 'বিয়ে করলি নে কেন?'

'কেন?' উত্তর দিয়েছিল মেনকা: 'গৃহিণী রোগে পড়বার জন্যে? তোকে কানে কানে বলি শোন্...'

ছবি ওর গোপন কথা শুনে বলেছিল: 'সত্যি? আর কোনোদিন তোর ছেলে হবে না? ইচ্ছে করলেও না?'

'না—' মেনকা মাথা নেড়ে জানিয়েছিল।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছিল ছবি।

এ বাড়ির প্রতিটি মেয়ের পিছনেই কিছুনা কিছু অতীত আছে। আর সেই অতীতের রঙ এক নয়। তবু একজায়গায় মিল আছে, ভোরে উঠে যখন উনুনে আঁচ দিতে হয়, স্টুডিয়ো থেকে ছুটি পেয়ে যখন ক্লান্ত চরণে বাড়ি ফেরে তখন কেউই হেঁসেল নিয়ে বসে না, দোকান থেকে আনা কিছু সস্তা খাবারেই রাত কাটিয়ে দেয় তারা।

ছবির পাশের ঘরের বিন্দু দেশ ভাগাভাগির ফলে বুড়ো মা বাপ আর স্বামীর হাত ধরে খুলনা থেকে এসেছিল কলকাতায়। ওর প্রাণবান স্বামীটা কলকাতায় পা দিয়ে যেন বখে গেল। মা বাবারা গেল ধুবুলিয়া ক্যাম্পে, ওর স্বামী ওকে নিয়ে এল ধর্মতলার এক ম্যাসাজ ক্লিনিকে, তারপর পুলিশের হুজ্জতি ধরপাকড়—অনেকবার অনেকের হাত বদলে পেশা বদলে বিন্দু এল এই বস্তিতে।

বিন্দু কাঁদছিল। আর, কী আশ্চর্য, মোটেই নাটুকে লাগছিল না ষোল বছরের গোল গোল মুখ মেয়েটার কান্না। একমাত্র কান্নার সময়েই এদের ভেতরের খাঁটি মানুষটা বেরিয়ে পড়ে। এ বাড়িতে মেনকার সঙ্গে ওর বেশি ভাব।

মেনকা জিগ্যেস করে: 'আহা, এই তিন বছর পরেও তোর কান্না থামল না, মুখ্যু কোথাকার?'

বিন্দু কান্না গলানো গলায় বললে, 'মুখ্যু বলেই তো কাঁদি ভাই। ঝড় উঠলেই আমাদেরই পুকুর পাড়ের নারকেল গাছটা সোঁ সোঁ শব্দ করত, আর তাই দেখে আমার কান্না পেত · '

'কান্না পেত, না হাতি!' ধমক দিত মেনকা 'চুপ কর ছিচ্‌কাঁদুনে মেয়ে। আবার কাঁদছে ছাখো। কী হয়েছে ছুঁড়ি পেট ব্যথা করছে?'

ফিশফিশ করে' জানাল বিন্দু 'ও এসেছিল ভাই·· '

'কে? তোর সোয়ামী? মুখপোড়া পাষণ্ডটা? ওই মিনসের জন্যে কাঁদিস? গলায় দড়ি জোটে না!'

'কী করব ভাই? ভালো হোক মন্দ হোক—সোয়ামী তো। আমার ভাগ্য তো ওর সঙ্গেই বাঁধা। স্বগ্‌গে হোক নরকে হোক আমাদের একই যাত্রা।' তারপর গলাটা নামিয়ে বিন্দু বললে, 'এতদিন পর মানুষটার সুমতি হয়েছে বোন। বললে, শীগ্রিই আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে।'

মেনকা খিঁচিয়ে উঠে বললে, 'এ নিয়ে কতবার হল!'

বিন্দু বলে চলল: 'এখান থেকে বেরিয়ে আমরা দুজনে যাব দক্ষিণেশ্বরে—মার কাছে সব পাপ উজাড় করে দিয়ে ক্ষমা নেবো। তারপর আমরা টিকিট কেটে দেশে ফিরে যাব।'

বিন্দুর বিশ্বাসের দৃঢ়তায় মেনকা হাসতে চেষ্টা করেও চুপ করে থাকে। রাগ হয়, তারপর করুণা হয়। আর গুম হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, 'তা' মিনসেকে এবার কতটাকা দিলি?'

'মাইরি বিশ্বাস কর্ ভাই—'

'করেছি। বল কত টাকা দিয়েছিস? কুড়ি? তারপর তোর সময়ে অসময়ে চলবে কী করে? না খেয়ে সতীলক্ষ্মী সাজবি? আর ওই মুখপোড়া মিনসে তো আর একমাস এ পথে হাঁটবে না। মর্ মর্—' দ্রুত ছিটকে পড়ে মেনকা।

এ বাড়িতে আর একজন থাকে। সুভদ্রা। এ বাড়ির দশজনের মধ্যে একজন নয়, সে একায় একজন। বিশিষ্টতায় অনন্য। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত তার আলাদা পরিচয়। বছর কুড়ি বয়স। শোনা যায় কিছু শিক্ষার জলও পড়েছে তার ব্যবহার-বুদ্ধিতে।

এ বাড়ির কারুর সঙ্গে তার মেশার গরজ নেই। ভাবখানা এই: 'আমি তোমাদের মতো পাঁকে পড়ে রয়েছি, কিন্তু শালুক বা ভাঁট ফুল নই, আমি পদ্ম।' প্রায় সময় ঘরে বসে থাকে, আয়নায় দাঁড়িয়ে অঙ্গ-ভঙ্গী মুখস্থ করে—তার আগামী কালের ভাবী দর্শকদের মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে বারবার সে যাচাই করে নেয়। সর্বক্ষণ সাজগোজে মত্ত। সামান্য প্রয়োজনে বাইরে বেরোতে গেলেও রুজে পাউডারে লিপস্টিক আর কাজলে মুখখানা দর্শনীয় করতে ভোলে না সে।

আড়ালে হিংসুটে মেয়েরা তার নামকরণ করে: 'মেয়ে তো নয়, ছাপাখানা।'

মাত্র ছ'মাস হল সুভদ্রা এসেছে এই বাড়িতে। বিহারের কোন্ এক ডাল্টনগঞ্জ থেকে বলাইবাবু—মানে সাপ্লায়ার বলাই ঘোষ তাকে নিয়ে এসেছে কলকাতায় দূর সম্পর্কের আত্মীয়তার সুযোগে। সুভদ্রার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন হিরোইন হওয়া, বলাইবাবু ছাড়া আর কে সে সাধ মেটাতে পারে!

আগামী দিনের টাকার পাহাড়ের স্বপ্ন দেখিয়ে ডাল্টনগঞ্জের বুড়ো উকিল সাহেব সুভদ্রার বাপকে হাত করতে সময় লাগেনি!

সুভদ্রা তিনবার ম্যাট্রিকে ফেল করেছে—বছর বছর খেলাধুলোয় প্রাইজ পেয়েছে। দৌড়ে হরিণগতি, ক্ষিপ্রতায় সে নেকড়ে বাঘকেও স্পর্ধা করতে পারে। গানের গলা নেই, অনুকরণের প্রতিভা আছে।

ছ'মাস শুধু কেটেছে কলকাতা দেখে-দেখে। সংগী বলাইবাবু। অত ব্যস্ত কেন, এসেছো—সিনেমায় নামবেই তো। দেখে নাও শহরটা—খোলা মন-প্রাণে একবার বেড়িয়ে নাও—ঝরঝরে হবে দেহমন, কর্মে উৎসাহ পাবে। শনৈঃ শনৈঃ। আগে আড়ষ্টতা কাটাও, জড়তা কাটাও। যেদিন হাজার হাজার বাতির সামনে দাঁড়াবে, সেদিন যেন কেউ গেঁইয়া অপবাদ না দিতে পারে!

এই ছ'মাসের মধ্যে একবার মাত্র সুভদ্রা সকলের সামনে মুখ খুলেছিল। যেদিন অনশনে-অনাহারে দুর্বল শশিমুখী গায়েব বসনে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে আত্মহত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়ল। এ্যাম্বুলেন্সে আহত শশীকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর সমস্ত বাড়িটা থমথমে হয়ে উঠলে সুভদ্রা বলেছিল: 'শশিমুখী টাকাকে ভালো বেসেছিল আর্টকে নয়। আমরা শিল্পী এই আমাদেব পরিচয়……'

কে একজন ব্যঙ্গ করে বলেছিল: 'আর্ট কি নয় আমরা বুঝি না। পেটের আগুনের আঁচে সব নয় ছয় হয়ে যায়।'

মেনকা গম্ভীরমুখে উত্তর দিয়েছিল: 'সুভদ্রাদি'র কথা ঠিক। শশীর কেরোসিন তেল ঢেলে আত্মহত্যার রকমটা, আর যাই হোক, সিনেমা-সিনেমা হয়নি।'

আর দাঁড়ায়নি সুভদ্রা, দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল।

অপেক্ষমান স্টুডিয়োর গাড়িটার হর্ণ বাজবার মিনিট কয়েকের মধ্যেই বলাই ঘোষ উদয় হয়। বেঁটেখাটো শরীর, কালো। উর্ধ্বাংগে রঙবেরঙের হাওয়াই সার্ট, নিম্নাঙ্গে লিনেনের প্যান্ট। চোখ দুটো নীল চশমায় ঢাকা থাকার জন্যে চট্ করে চোখের ভাব বোঝা যায় না। ঠিক কপালের ওপর

সিঁদুরের ফোঁটা, কেমন তান্ত্রিক বলে' ভুল হয়। ঈষৎ চ্যাপ্টা মুখ আর কব্জি, পরিচয় বহন করছে মানুষটার প্রকৃতির। হৃদয় নয়, তার সব জোর নিহিত রয়েছে শক্ত চওড়া কব্জির মধ্যে। শোনা যায়—যুদ্ধের সময় খড়ের ব্যবসায় হাত লাগিয়েছিল বলাই ঘোষ, ব্যবসাটা পাকতে-না-পাকতে হঠাৎ একদিন খড়ের গুদোমে আগুন লাগল, আর কী আশ্চর্য, দমকল এসে আগুন নেভাবার পর পোড়া ছাই গাদার মধ্যে দগ্ধ-বিকৃত বলাই ঘোষের স্ত্রীকে পাওয়া গেল। হাঙামা মেটাবার জন্যে পুলিশকে কিছু টাকা ঢালতে হলেও অভিজ্ঞতার বনেদ পাকা হল বলাইয়ের। পরবর্তী জীবনে অভিজ্ঞতাটার আর-একটা পিঠ স্পষ্ট হল চোখের সামনে। খড় আর মেয়েমানুষ দুই-ই দাহ্য পদার্থ। তিলে তিলে মেয়েমানুষগুলোকে পোড়াবার জন্যে তার খোঁয়াড়ে ঢোকাল বলাই। খড় ছেড়ে দিয়ে মেয়েমানুষ-এর ব্যবসায় হাত পাকিয়ে-পাকিয়ে বলাই ঘোষ আজ সিদ্ধপুরুষ।

মেয়েরা সকলেই প্রায় তৈরি হয়েছিল। তবু তাড়া দিল বলাই ঘোষ: 'কই গো মেয়েরা আর দেরি কেন?'

এক দুই তিন। মেনকা, ছবি, বিন্দু, পটল—একে-একে সব মেয়েই জড়ো হয়। কিন্তু···বলাই ঘোষের চোখকে ফাঁকি দেয়া সহজ কথা নয়।

'শোভা, শোভা কোথায়?'

মেনকা বললে, 'ওর শরীর ভালো নেই···'

'মেয়েমানুষের শরীর আবার কবে ভালো থাকে?'

বলাই বিরক্ত গলায় বলে উঠল। 'দেখছি, দেখছি আমি—আজ শুটিং—আর হলেই হল শরীর খারাপ···'

মেনকা বললে, 'ও থাক না বলাইদা। আট মাসে ও আর নড়তে পারে না। একে তো পাণ্ডুরোগে ভুগছে···'

বলাই জ্বলে উঠল: 'আট মাস!···মাগী আবার বিয়োচ্ছে! কুত্তী—কুত্তীরও অধম। বছর বছর গর্ভধারণ করতেও ভালো লাগে মাগিটার! এই শোভা—শোভা···'

ছবি ফিশ ফিশ করে বলে উঠল: 'লোকটা মানুষ না পশু?'

'চুপ, চুপ···' মেনকা ধমকের সুরে বললে।

বলাই ঘোষের পেছন পেছন শোভাকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। শাড়ির বেষ্টনীর আড়ালেও ভারী কোমরের চেহারাটা ঢাকা পড়েনি।

কাঁধের আঁচলটা কোনো-রকমে অবলম্বন পেয়ে ঝুলে রয়েছে শুধু। মুখ হাঁ করে' নিশ্বাস টানছে শোভা, ডিমের মতো বিবর্ণ মুখময় পাউডারের পুরু প্রলেপ। বোধহয় কান্নার দাগগুলো ঢাকবার জন্যে।

অন্য মেয়েরা থ' হয়ে দেখছে। সমস্ত অনুভূতি শূন্য, ধোঁয়াটে।

'চল—জোরে পা ফেলে চল—' বলাই হেঁকে উঠল।

মেয়েগুলোকে বাড়ি থেকে বা'র করে দিয়ে বলাই-ও বাইরে পা দিয়েছিল, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল সুভদ্রা। 'বলাই দা—'

ফিরে দাঁড়াল বলাই। হাসল।

'কী, এই ছ' মাসে বলাইদা'র ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছ তাই না?'

'আমি আর পারছিনে বলাইদা, হাঁফিয়ে উঠছি। বলতে পারেন বসে বসে আপনার আর কত ঋণ বাড়াব।' সুভদ্রা বললে।

বলাই হেসে বললে, 'ঋণ শোধ করে' দিলেই তো পাবো।'

সুভদ্রা বললে, 'সামর্থ থাকলে কী আর ঋণ করতুম। জানেন তো আমাদের সংসারে টাকার কত দরকার।'

বলাই একটু থেমে হঠাৎ বেয়াড়া প্রশ্ন করল: 'আচ্ছা, সত্যিই কি তুমি সিনেমায় নামতে চাও?'

বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে' অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সুভদ্রা বলাই ঘোষের দিকে। তারপর চোখ নীচু করে' ক্লান্ত গলায় বললে, 'শিল্পী না হয়ে আমার উপায় নেই...'

বলাই পকেট থেকে সিগারেট-কেস্ বের করে' সিগারেট ধরাল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'তাহলে এতদিন বলিনি শোনো। একটা চান্স পেয়েছি। পরশুদিন। ডিরেক্টার সান্যালের কাছে তোমাকে নিয়ে যাব। তোমার কথা আগেই বলে রেখেছি।'

'ডিরেক্টার সান্যাল—মানে সাহিত্যিক সান্যাল...সত্যি, সত্যি বলছ বলাই দা—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি, বলাই ঘোষ মিথ্যা কথা বলে না।...এখন তো সময় নেই। আচ্ছা রাত্রে আসব—কথা হবে।' শিস দিতে দিতে বলাই ঘোষ বেরিয়ে গেল।

ঘরে ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে নিজেকে দেখতে লাগল সুভদ্রা। হাজারটা দর্শকের পিপাসার্ত্ত বিমুগ্ধ চোখ। জোনাকি নয়, তারকা। এবং সর্বশ্রেষ্ঠ তারকা।

টিনের তৈরি গেট পেরিয়ে গাড়িটা স্টুডিয়োর মধ্যে সেঁধোতে বিন্দু কথা ক'য়ে উঠল : 'ওই লম্বা লম্বা নারকেল গাছগুলো দেখলে আমার খুলনার কথা মনে পড়ে…'

'আমার ঢাকার কথা মনে পড়ে!' ভেঙচি কেটে বললে মেনকা : 'তুই চুপ করবি মুখপুড়ী মেয়ে কোথাকার।'

বিন্দু একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ করে' রইল।

বড় শেডটার কোণ ঘেঁসে গাড়ি থামল। ত্বরিত চরণে নেমে পড়ল বলাই ঘোষ। মেয়েগুলোকে তাড়াতাড়ি নেমে পড়তে সাহায্য করল। এরপর মুক্ত অবকাশ। মেয়েদের কী করতে হবে তারা জানে। গাদাগাদি করে' শেডের পূবদিকের দমবন্ধ-করা ঘরটায় চুপ করে' পড়ে থাকতে হবে। যথা সময়ে খবর আসবে। ড্রেসার আর মেক-আপের ঘরে প্রায় দল বেঁধেই মেয়েরা হাজির হবে। ক্ষিপ্রহস্তে দুজন মেক-আপ ম্যান তাদের চ্যাপ্টা ভাঙাচোরা ভোঁতা মুখে রঙ চড়াবে, ভুরু আঁকবে। কারুর গালে একদিকে চড়া রঙ অন্যদিকে রঙের স্পর্শ না-থাকলেও বলবার যো নেই। ভুরুর রেখা ছোট বড়ো হলেও প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। পাঁচ টাকার এক্স্ট্রাদের এর বেশি নজর দেবার সময় কোথায়।

ড্রেসারদের খাটনি কম। ফর্দ মতো জামা, শায়া, শাড়ি বিলিয়ে দিয়ে শুটিং-এর শেষে সেগুলো হিসেব মত ফেরত নেয়াই তাদের কাজ। পোশাক বদলাবার অন্য কোনো ঘর নেই ওই সব মেয়ের। একসংগে কলরব তুলে তারা আটপৌরে বসন ছাড়ে, জামা-কাপড় ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে পরস্পরের গায়ে গোপিনীদের মতো, তারপর স্টুডিয়োর-দেয়া জামা-কাপড়ে নিজেদের সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলে।

আসল শুটিংটা যেন তাদের সাজঘরেই শুরু হয়। ফ্লোরে দাঁড়িয়ে হাজার বাতির আলো কিংবা ক্যামেরার চোখ তাদের প্রস্ফুটিত করবার জন্য ব্যস্ত হয় না। ওরা যেন 'উদ্দীপন বিভাব'—হিরো হিরোইনকে মূর্ত করার জন্যেই তাদের সৃষ্টি। ক্যামেরার ক্লোজ-আপে তাদের মুখের আদলের প্রয়োজন নেই—দেখাও তোমার জরির কাজ-করা চকচকে শাড়ি, ঝকঝকে জামার ফাঁকে দর্শক-বিদ্ধ করা বক্ষের কারসাজি। তোমরা নহ মাতা, নহ কন্যা, বধূও নও—তোমরা শুধু যৌন-গন্ধ-বিতরণ-পটিয়সী রম্য-রমণী।

কিন্তু…কতক্ষণ আর এই গুমোট গরমে বসে থাকতে হবে। এ ঘরে

পাখা নেই। ডিরেক্টারের ঘরে দিনরাত পাখা চলে, ঘরে কেউ না-থাকলেও চলে। হিরোইনের খাশ কামরাতেও পাখার সবেগ আওয়াজের বিরাম নেই। গরমে ছটফট করে মেয়েরা, অব্যক্ত যন্ত্রণায় থেকে থেকে কঁকিয়ে ওঠে শোভা।

ছবি বললে, 'সেদিনকার মতো এবারও রাত বারোটার আগে আমাদের ডাক পড়বে না বলে মনে হচ্ছে।'

'রাত বারোটা! বাবা! এখন তো সাতটাও হয়নি!'

শোভা কাতরাচ্ছিল। অনেকক্ষণ বসে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করে' আর পারেনি, ধুলো মলিন সতরঞ্চের উপরেই গড়িয়ে পড়েছে।

'খুব কষ্ট হচ্ছে মাসি?' মেনকা শুধালো।

শোভার মুখ থেকে অব্যক্ত যন্ত্রণার জান্তবধ্বনি থেকে থেকে বেরিয়ে আসে।

'পেটে হাত বুলিয়ে দিই, দেবো?'

'দে—'

শক্ত পিলে রোগীর মতো পেট। কিলবিল করে' নড়ছে পেটের পোকাটা। আর তখনই যন্ত্রণায় আঁতকে উঠছে শোভা। হাতের স্পর্শে পেটের বাচ্চাটার অস্তিত্ব স্পষ্ট বুঝতে পারে মেনকা। হঠাৎ একদিকে পেটটা ফুঁড়ে ক্ষুদে দানবটার কখনো মাথা, কখনো পা নিশানা দিয়ে ওঠে, একটু হাত বুলোনোর পর কমে আসে দস্যিপনা।

'বারবার যে কেন ভুল করো মাসি—' সমবেদনায় ভিজে ভিজে গলা মেনকার।

'ভুল! কিসের ভুল। মেয়েমানুষের বাচ্চা বিয়োনোর জন্যেইতো জন্ম!' শোভা বিড়বিড় করে ওঠে। 'নইলে ভগবান আমাদের গর্ভধারণের ক্ষমতা দিয়েছে কেন?'

বাইরে সান্ধ্য হাওয়ার উচ্ছ্বাসে নারকেল গাছের পাতাগুলো কাঁপছে, ঝিরঝির। চাঁদও উঠবে টিনের শেড ভেদ করে'।

বিন্দুর চোখ ছিল বেপথু নারকেল গাছগুলোর দিকে। তাদের গাঁয়ের পুকুর পাড়ের সেই নারকেল গাছটা সন্ধ্যার আসরে ঠিক এমন করে' খুশিয়াল হয়ে উঠত···চাঁদও উঠত, পুকুরের কালো জলে গা ধুতে ধুতে অনিমিষে চেয়ে থাকত বিন্দু।

'জানো মেনকা, আমাদের গাঁয়ের দাদাঠাকুর বলত: 'নারকেল গাছ নাকি বামুন, পৈতে আছে।' ফিশফিশ করে' বললে বিন্দু।

মেনকা এবার রাগল না, হেসে বললে, 'তোর যত ভূতুড়ে কথা। একেবারে গেঁয়ো বাঙাল তুই।'

বিন্দু বললে, 'বিশ্বাস করলে না তুমি? তাহলে শোনো। আমাদের পাশের গাঁয়ে চক্কোত্তীদের উঠোনে একটা বিরাট নারকেল গাছ উঠেছিল। কারুর নিষেধ শুনলে না তারা, গাছ কেটে উড়িয়ে দিলে। আর তারপর বছর ডিঙোতে না ডিঙোতেই চক্কোত্তীদের সাত-সাতটা জোয়ান ছেলে পট পট করে' মরে' গেল...'

'মরে গেল ' ধুয়ো তুলল পটল।

আটটা গড়াতে না গড়াতে ওদের ডাক পড়ল। যাও মেকআপ রুমে, তারপর ড্রেসারদের ঘরে।

সার বেঁধে বসে পড়ল তারা মেকআপ ম্যানদের সামনে। আর পুজোর মরশুমে যেমন মেটো প্রতিমাদের গায়ে পাইকারী হারে চুন আর রঙ চড়ায় কুমারেরা তেমনি করে' কাজে লেগে গেল মেকআপ ম্যান দু'জন।

মাথার ওপরে শিবচূড়ার মতো চুলগুলো গুছিয়ে বেঁধে মুখটা এগিয়ে দিল মেনকা।

'বসিরদাদু' রঙটা একটু পাকা করে' দিও মাইরি—'মেনকা চটুল হেসে বললে।

কাঁচাপাকা চুল বসির মিঞা, কপালে বার্ধক্যের ভাঁজ, চোখের কোলে অভিজ্ঞতার আঁকিবুঁকি।

'পাকা রঙের পরে এত টান কেন নানী?'

'আমরা যে রঙ্গিলা গো। রঙ যত পাকা হয় ততই রঙ্গ..'

'কত রঙই তো করলাম নানী—কোনো রঙই পাকা হল না।' ওর মুখে রঙের তুলি বুলোতে বুলোতে বললে বসির। 'আসল রঙ হল মাটি—কবরের মাটি।'

অদ্ভুত ভালো মানুষ এই বসির মিঞা। তার সমস্ত চরিত্রের মধ্যে কেমন বিষন্ন বৈরাগ্যের সুর। মেয়েরা ভালোবাসে তাকে। তার সেই বৈরাগ্যের বিষন্নতাকে। তার সম্পর্কে সবচেয়ে আশ্চর্য খবর: সাতান্ন বছর

বয়েস হল এই স্টুডিয়োর লাইনে, কোনোদিন কোনো ছবি-গড়া, বা গড়ে ওঠা ছবি দেখেনি সে।

বলে : 'কোনো রঙই তো পাকা নয় বাছা, ছবিতে যাদের মুখ দেখব তাদের তো রঙ পালিশ করেছি আমিই। রঙের চালাকি চিনে চিনে চোখ আমার বুড়িয়ে গেছে।'

ওদিকে ছবিও ফুসলাতে আরম্ভ করেছে ছোকরা ফলি মিস্ত্রিকে। 'মিস্ত্রিভাই, আমার ভুরুদুটো একেবারে চিলের ডানার মতো টান টান করে' দিও, মাইরি।'

ফলি মিস্ত্রি হেসে বলে : 'কেনে? চিল হয়ে কোন্ ভাগাড়ে ছোঁ দেবে গো?'

'না মাইরি টেনে দাও—দেখোনা হাতে টাকা জমুক একদিন তোমায় নিজে রেঁধে খাওয়াব। এই তোমায় ছুঁয়ে বলছি '

'উঁহু আমি লগ্দা কারবারি · এখন খাওয়া—' ফলি মিস্ত্রি মুচকে হাসে।

'মরণ আর কী! এই হাটের মাঝে · '

মেক আপ শেষ করে' ওরা ছুটল ড্রেসারের ঘরে।

পোশাক পরার মতো আনন্দ আর মেয়েদের নেই। আবার সে পোশাকের উদ্দেশ্য যদি লোকরঞ্জন করাব জন্যে হয়ে থাকে তাহলে আর কথাই নেই। ঠোঁটে মুখে রঙের পালিশ পবার মনটা আগেভাগেই রঙিন হবার চেষ্টা করেছে, পোশাকে সজ্জিত হয়ে মনটা খুশির ফানুশের মতো ওড়বার আয়োজন করে।

ছবি বললে, 'আমাকে যদি কেউ এমন ধারা কেবল শাড়ি জামা পরতে দিত, তাহলে…'

'তাহলে কি?'

'তাহলে তার পায়ে দাসী হয়ে থাকতাম · ' ছবি বললে।

পটল ঘাগড়াটা কটিদেশে বাঁধতে বাঁধতে বললে, 'তাহলে নিউ বেঙ্গল সোসাইটিকে বে' কর না · '

মেনকা হেসে বললে, 'রাজরাণী হবি আর রাজভোগ খাবি নে, তা কি হয়। ছুটো বিয়ে করবি। আর একটা ভীম নাগকে।'

খিল খিল করে' হাসির বেলোয়ারী আওয়াজ উঠল।

'বিন্দু, ভাখতো ঠিক বাঁধা হয়েছে কিনা?' মেনকা ডাক দিল।

'কি?'

'আ মুখপুড়ী! বজ্জ-গরবে ম'লি! ভাখনা আমার বুক ছুটো সমান হয়েছে কিনা?' ধমক দিল মেনকা।

'মেনকা অ মেনকা—' স্ফীত কোমর নিয়ে হিমসিম খায় শোভা।

'মাসি ডাকছ?'

'হ্যাঁ'—হাঁফাতে হাঁফাতে বললে শোভা: 'আমার শাড়িখানা দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধ তো · '

মেনকা আশ্চর্য গলায় বললে, 'কী বলছ মাসি? তুমি কী পাগল হলে?'

'তুই কেবল ফ্যাচাং করিস মেনকা—' শোভা রোষভবে বললে: 'তোর কী ধারণা তুই-ই কেবল সেয়ানা, আমরা সব মুখ্যু বোকা…'

'তুমি রাগ করছ মাসি। বুঝতে পারছ না পেটটা ওইভাবে কসে বাঁধলে, বাচ্চার কথা ছেড়ে দিলাম, তোমার কত কষ্ট হবে।' মেনকা বললে।

'আ ম'লো যা। মেয়ে মানুষের গতর—তার আবার কষ্ট অ-কষ্ট! তাছাড়া আমি কী ভদ্দর লোকের পোয়াতী বৌঝি যে আমাকে বসে বসে খাওয়াবে ··'

মেনকা আর কথা বাড়াল না। নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শাড়িখানা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে বাঁধতে লাগল শোভার স্ফীত উদরের উপর দিয়ে।

'আ মর ছুঁড়ি! আরো কসে' বাঁধ।' দাঁতে দাঁত এঁটে দম বন্ধ করে রইল শোভা।

শাড়িখানা পেঁচাতে গিয়ে মেনকাই যেন ঘেমে নেয়ে একশা হয়ে যায়। জোর দিতে গিয়ে জোর পায় না। কতোটা জোর দিলে শোভার লাগবে না ভাবতে-ভাবতেই তার বাঁধন আল্গা হয়ে যায়। শোভা যদি তাড়া না দিত, তাহলে কসে' বাঁধাই হত না তার পক্ষে। শোভার তাড়নায় আতংকিত হয়ে উঠল সে, আর কোনোরকমে চোখ বুজেই কষ্টকর কাজটা সেরে ফেলল।

শোভা হাঁফাচ্ছিল। কপাল বেয়ে টসটস করে ঘাম ঝরছে, সারা মুখটায় যেন হঠাৎ রক্তের উচ্ছ্বাস এসে গেছে! আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের শরীরের দিকে চেয়ে সে অবাক হয়ে যায়। পলক পড়ে না। অতবড় পেটটা যে এইভাবে বেমালুম হারিয়ে যেতে পারে, ভাবতেও পারেনি শোভা।

কিন্তু···দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিজের এই পরিবর্তিত শরীরের রূপ দেখবার সময় কোথায়। ওদিক থেকে খবর এল। প্রথমেই শোভার শুটিং। তাড়াতাড়ি নাচের পোশাকটা পরে' নিল সে। নাচ তো কচু! বগল নাচাও আর বক্ষদেশ যতখুশি দোলাও। আর ক্যামেরার চোখের দিকে চেয়ে অলক্ষ্য অগণিত দর্শকের উদ্দেশে চোখ মারো। দৃশ্য-পরিকল্পনাটা এইরকম : বিবাগী নায়ক লক্ষ্যভ্রষ্ট পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হঠাৎ ফুটপাথের বুকে পথচারীর আটকানো ভিড়···হারমোনিয়মের সুর আর নৃত্যরতচরণের ঘুঙুরের আওয়াজ।

শেষবারের মতো আয়নায় মুখখানাকে দেখে নিয়ে ত্বরিত চরণে বেরিয়ে গেল শোভা।

জামা-কাপড়ের স্তূপের ওপর মুখ গুঁজে চুপ করে' বসে ছিল মেনকা। হাতে শাড়িটা ধরা রয়েছে, শায়াটা কোমরে বেঁধেছে কোনোরকমে। কতক্ষণ অন্যমনস্কের মতো ওইভাবে বসে থাকত বলা যায় না। ছবির ডাকে চমক ফিরল।

'কী রে, কী হল তোর?'

'এঁ্যা।' চমকে উঠে হাসল মেনকা।

'কী ভাবছিলি রে?' ছবি শাড়ির আঁচল ঠিক করতে করতে জিগ্যেস করল।

'দিদির কথা মনে পড়ছিল···' মেনকার সলজ্জ হাসি।

'দিদি না, আর কেউ?' চোখ টিপল ছবি।

'জামাইবাবু বোধহয় এতদিনে দিদির কাছে ফিরে গেছে। আমাকে হাসপাতালে ফেলে রেখে সেই যে উধাও হল, শোভা মাসির সংগে দেখা না হলে বলাইবাবুর আশ্রয় জুটত না···'

'হঠাৎ এসব কথা মনে পড়ল কেন? তোর মন খারাপ হলে আমরা যাব কোথায়! তুই হাসিস বলেই তো আমরাও হাসতে ভুলিনি। নে ওঠ ভাই—শাড়িটা পরে' নে।'

সত্যিই তো, হঠাৎ কেন মনটা খারাপ হয়ে গেল! ভেবে উঠতে পারেনা মেনকা। তবে কী শোভা মাসির শারীরিক অবস্থার কথা ভেবেই মন খারাপ হয়ে গেল!

কী-একটা কথা মনে পড়ে ঘরের ও কোণ থেকে হঠাৎ বিন্দু হেসে উঠল। বোবা-ধরা ঘরটার মধ্যে হঠাৎ এই সজাগ হাসির আওয়াজ যেন

ছন্দঃপতন। অন্য সময় হলে অন্যেরা বিরক্ত হত। কিন্তু, আজ যেন বিন্দুর হাসিটা সকলের ভালোই লাগল। বহুক্ষণ গুমোট আবহাওয়ার পর হঠাৎ হাওয়া বইলে যেমন হয়।

'অ মেনকা অ ছবি—শীগ্‌গির শীগ্‌গির—' হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল পটল।

'কী, কী হয়েছে?' সকলে প্রায় সমস্বরে চিৎকার করে' উঠল।

পটল বললে, 'শোভা নাচতে নাচতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে।'

'এ্যাঁ!'

বিন্দু কেঁদে উঠল।

ছুটতে-ছুটতে মেনকার একটা কথা মনে হল: পেট লুকোতে গিয়ে ওই পেটই তবে ডোবাল শোভা মাসিকে!

সেটের মধ্যে থেকে তুলে এনে একটা শোফায় শোয়ানো হয়েছে শোভাকে। বিশ্রী কালো ঘামে আরো কালো হয়ে উঠেছে রঙ করা মুখ, চোখের কাজলকে লজ্জা দিয়ে আরো পুরু গভীর কালি পড়েছে সারা চোখে।

মূঢ় বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েরা।

পটল একসময় ফিশ ফিশ করে' বললে, 'শোভার শাড়িটার দিকে চেয়ে ত্যাখ।'

'রক্ত!' স্বগতোক্তি করল মেনকা।

'বুঝলেন মিঃ বোস—' সিনারিও লেখক বিনায়কবাবু পরিচালককে বললেন: 'এই সব মেয়েরা প্রবৃত্তির বশে যা হয়, সাইকলোজিকালি ওরা যা হতে পারেনা।'

মিঃ বোস চিন্তিত হয়ে বললেন: 'এই অবস্থায় মেয়েটা নাচতে এল কেন? দেখুন দিকি পেটে আবার পেঁচিয়ে কাপড় বেঁধেছে। উঃ হরিবল।'

বিনায়ক বললেন, 'পশু, জঘন্যতম পশু…'

'আচ্ছা, বলাই ঘোষটারও কী আক্কেল!…ভালোয়-ভালোয় পার পেলে হয়। আবার না খেসারত দিতে হয়।'

'মিঃ বোস—'

ক্যামেরাম্যান বিজয়েশ দাশ।

'হোল্ টেকিংটাই কী কেটে বাদ দেবেন?'

'কেন ? বাদ দেবো কেন ?' বিরক্ত হয়ে বললেন মিঃ বোস।

'মানে—মাচটা তো কমপ্লিট হল না...' বললেন বিজয়েশ।

'হাউ সীলি!' মিঃ বোস বললেন, 'নাচতে-নাচতে কী কারুর পদস্খলন হয় না ? নাকি শোনেন নি কোনোদিন নাচতে-নাচতে কোনো মেয়ে পড়ে' গেছে ?...কী বিনায়কবাবু সেটা কী একেবারে অসম্ভব ?'

বিনায়ক বললেন, 'না। মোটেই অসম্ভব নয়।'

মিঃ বোস বললেন, 'তাহলে আপনি গল্পটা একটু টুইস্ট করে' দেবেন।'

'আচ্ছা। সে আর বলতে হবে না।'

ড্রাইভার এসে জানাল : গাড়ি প্রস্তুত।

'বলাই ঘোষ এসেছে ?' পরিচালক বোস জিগ্যেস করলেন। 'আসেনি ? রতন, ওহে—'

রোগা রোগা পাতলা চেহারা। গায়ে একটা চেক সার্ট আর পাজামা। যেমন হাসতে পারে তেমনি পারে হাসাতে। স্টুডিয়োতে যখনই যে কোম্পানীর ছবি হয়েছে প্রতিটি সেটে রতন হাজির। তাকে কোন্ এক বন্ধু পরামর্শ দিয়েছে : 'বছর কয়েক লেগে থাকো। তারপর একদিন-না-একদিন কমেডিয়ান হিসাবে তুমি চান্স পাবেই।' মাঝে মাঝে বেনামী জনতার ভিড়ে সে যে দু' একবার ক্যামেরার সামনে না-দাঁড়িয়েছে অমন নয়। কখনো চাকরের চরিত্রে ট্রেহাতে, কখনো হোল্ড অল কাঁধে কুলি বেশে ছবিতে তাকে দেখা গিয়েছে। দু' একবার কথা বলবারও সুযোগ পেয়েছে সে।

'ভাই রতন—' মিঃ বোস বললেন : 'এই কাজটা উদ্ধার করে' না-দিলে তো হয় না। তুমি ভাই এই মেয়েটিকে নিয়ে ইসলামিয়া হাসপাতালে যাও—সেখানে এমারজেন্সিতে আমার বন্ধু ডাঃ লাহিড়ী আছেন—তাঁকে বললেই সব ব্যবস্থা করে' দেবে। আর এই টাকাটা রাখ...'

রতন এককথায় রাজি। 'এই মেয়েরা, ধরোতো শোভাকে, ধরাধরি করে' ওকে গাড়িতে তুলে দেবে...'

'স্যার—' ড্রেসার অন্নদা মালি।

'কী, তোমার আবার কী ?' ডিরেক্টার বোস জিগ্যেস করলেন।

অন্নদা চোখ নিচু করে' বললে, 'ওর পোশাকগুলো যে খুলে নিতে হবে স্যার—'

'হোয়াট।' গর্জন করে উঠলেন মিঃ বোস। 'আই মিন, তুমি মানুষ না পশু·· দেখছ মেয়েটার এই অবস্থা···'

'কী করব বলুন স্যার, পোশাকের হিসেব তো আমাকেই রাখতে হবে। তবে দিন স্যার, আমার খাতায় সই করে', হিসাব পরিষ্কার থাকুক।'

রাগে গশগশ করতে-করতে সই করে' দিলেন মিঃ বোস।

বিনায়ক জিগ্যেস করলেন: 'আজ আর শুটিং হবে?'

'মানে—' মিঃ বোসের চোখে ভ্রূকুটি: 'শুটিং হবে না মানে? স্টুডিয়োর ভাড়া গুনতে হবে না? হোপলেশ! আরে মেয়েরা, তোমরা এখানে কী করছ—যাও, যাও—রেডি হও—'

'আমার একটা কথা ছিল···' মৃদু গলায় জানাল মেনকা।

'কী, কী বলো?' মিঃ বোস গভীর বিরক্তিতে প্রাগ্ করলেন।

'আমি ওর সংগে যাব—' মেনকা বললে।

'কার সংগে?' যেন শুনতে পেয়েও বুঝতে পারলেন না কথাটা মিঃ বোস।

'শোভার সংগে—'

'শোভা! আই মীন স্যাট ফুলিস গার্ল!··· ও কে হয় তোমার?'

'আমার মাসি।' মেনকা বললে।

'আই সী। কিন্তু তোমার শুটিং আছে যে! আচ্ছা—আমি অন্য কাউকে দিয়ে ম্যানেজ করে' নেবো। যাও তুমি।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে গেল মেনকা।

অনেক রাত্রি করে' হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরল মেনকা। গলির মোড়ে থমথমে অন্ধকারের দিকে চেয়ে হঠাৎ কেমন এক হিম-হিম নির্জনতায় বিষণ্ণ হয়ে উঠল মনটা। সমস্ত সন্ধ্যাটা গেছে একভাবে। শোভার দুর্ঘটনায় মনটা আরো ভারগ্রস্ত হবার প্রশ্রয় পেয়েছে।

একটা নিশ্বাস ফেলে বাড়িতে ঢুকল মেনকা।

ভেবেছিল চুপিসারে ঘরের তালা খুলে নিঃশব্দে শুয়ে পড়বে। কিন্তু ····শেকল খোলার আওয়াজে সাড়া পেয়ে উঠে এল বিন্দু।

'এত দেরি করে, ফিরলে?'

বিন্দুর গলার আওয়াজে পটল ছবি পর্যন্ত এসে জুটল।

'কেমন আছে শোভা মাসি? জ্ঞান হয়েছে তো?'

মেনকা বললে, 'জ্ঞান হয়েছে···দিন কয়েক পরেই খালাস হতে পারবে হাসপাতাল থেকে।'

ভালো লাগছিল না। কিছু ভালো লাগছিল না। সারা দেহ জুড়ে ক্লান্তির বন্যা। চোখে হাজার ঘুমের জোনাকি ডাকছে।

'তোরা যা। আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে—'

নিঃশব্দে সকলে বিদায় নিল। বিদায় নিয়ে যেন বাঁচল। সারা সন্ধ্যে-রাত্তিটা স্ট্ডিয়োতে তো কম খাটনি যায়নি!

জামা কাপড় না ছেড়েই কাত হয়ে পড়ল মেনকা বিছানার ওপর। চোখে হাজারো ঘুমের জোনাকি, চোখের পাতা দুটো জ্বলে যাচ্ছে, তবু ঘুম নামছে না চোখের পাতায়। হিজিবিজি কত ছবি ভেসে উঠছে চোখের ওপর। এপারে ক্যানিংগঞ্জ ওপারে আমঝাড়া গ্রাম—মাঝে দুরন্ত মাতলা নদী···লোনা নদী, লোনা ঢেউ, গ্রীষ্মের জলকষ্ট, ছাতিফাটা মাটি, আর সর্দারদের টলটলে পুকুরের খাড়াপাড়—চির রুগ্না দিদির শরীরের কংকাল, জামইবাবুর কেয়াবি-করা গোঁফ—আরো অনেক-অনেক ছবি—মাতলা নদীতে নৌকা দুলল, সামাল সামাল মাঝি, আবার গঞ্জ, ট্রেণ ঝিকিঝিকি···শহর কলকেতা···

ছবি এসে না ডাকলে বোধহয় ছবি দেখার নেশা কাটত না মেনকার।

'অ মেনকা—এই ওঠ্ ওঠ—শীগ্গির আয়···' ছবি ওর হাত ধরে' টানতে লাগল।

'কী হয়েছে—যা বিরক্ত করিসনে—'

'আয়না—ওঠ্—দেখবি আয়—'

ছবি টানতে টানতে ওকে নিয়ে এসে দাঁড় করাল সুভদ্রার দরজার কাছে।

'শুনতে পাচ্ছিস?' দরজায় কান পেতে ফিশফিশ করে বললে ছবি।

'কার গলা?' মেয়েলী কুতূহল তীব্র হল মেনকার।

'বলাই ঘোষ—' ছেনালী ভঙ্গিতে চোখ টিপে বললে ছবি: 'নিশি যাপন হচ্ছে যুগলের। বহুদিন থেকে চার ফেলে-ফেলে টোপ দিয়েছে···শিল্পী হবার পাঠ নিচ্ছে সুভদ্রা। হিঃ-হিঃ।' আঁচলে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে ফুলে-ফুলে হাসতে লাগল ছবি। 'বলাইবাবুর বগলে দুটো বোতল। হিঃ-হিঃ—হিঃ-হিঃ।'

অন্ধকার ঘরের ভেতর থেকে চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে!

'অ মেনকা—রিহার্সাল শুরু হয়েছে—'

'বলাইদা আপনি—আপনি…' সুভদ্রার গলা 'আপনার পায়ে পড়ি আপনি আমার দাদার মতো…'

বলাই ঘোষ জড়ানো গলায় কী-একটা উত্তরও দিল, স্পষ্ট বোঝা গেল না।

মেনকা আর দাঁড়াতে পারছিল না। পুরানো ইতিহাস, রাত্রিও পুরানো। কৌতূহলটা আদিম, নতুনত্বহীন। দ্রুতপায়ে ফিরে এসে এবার ঘরের দরজা বন্ধ করে' দিল সে।

ছবি তখনো দাঁড়িয়ে আছে দরজায় কান পেতে। ঘরের ভেতরের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি আওয়াজ নিজের পুরানো অভিজ্ঞতা দিয়ে ঠিক-ঠিক মিলিয়ে নিতে চায় সে।

কে কেঁদে উঠল না? শোভা মাসি—? না। কান্না নয়, রাত্রির শিশিরের শব্দ সজনে পাতায় আক্ষেপ শুরু করেছে। টপ টপ—টপ টপ। না—চোখের জল নয়, চোখের পুকুরের জল কবে খরগ্রীষ্মের দাবদাহে শুকিয়ে চৌচিব হয়ে গেছে। কে হাসছে? ফনি মিস্ত্রি? 'আমি নগদা কারবারি।' হাসি পায়, কারবারটাই শুধু নগদ, মালটা যে বাসি—সে খবর কি মিস্ত্রি জানে না? নাকি, হরিণের মাংস বাসি হলেই সুন্দর লাগে!

আবার কান খাড়া করে' রইল ছবি।

আর কোনো শব্দ নেই। শুধু জমাট কালো অন্ধকার-দুপুররাত্রিতে মা কালীর সামনে বলি-দেয়া মহিষের মতো—রাত্রির অন্ধকারে রক্তের রঙ-ও কালো।

মাথার ওপরে সিলিঙ-এর ওদিক থেকে একটা গুবরে পোকা করাত-চেরা কাঠেব মতো ঘস্ ঘস্ শব্দ করে' চলেছে।

অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল সুভদ্রার। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না একটুও। মাথার ভেতরটা কেমন ভোঁতা-ভোঁতা। সারা শরীরে কেমন শাদা অবসাদ। আমি কি সেই সুভদ্রা—ডালটনগঞ্জের দৌড় ঝাঁপে প্রাইজ-পাওয়া-কন্যা। এই হাত, এই মুখ, এই শরীর এগুলো কি আমার, শিরায় রক্ত বইছে সে-রক্ত কী আমার। আমি কি সেই, আমি কি সেই!

হাই তুলে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সুভদ্রা। রোজকার মতো আয়নার সামনে দাঁড়াল। আয়নার কাচটা আজো তেমনি উজ্জ্বল, একটুও ঝাপসা হয়নি, কোথাও একটুও দাগ পড়েনি। দাগ পড়েনি? কিন্তু…সারা মুখ জুড়ে এত রক্তের উচ্ছ্বাস এল কি করে'? এত লাল দেখাচ্ছে কেন। একবার ভীষণ সর্দি হয়ে এমন লাল-লাল দেখাচ্ছিল তার মুখখানা। আমার কী সর্দি হয়েছে? কই না তো। নিশ্বাস-প্রশ্বাস এখনো সহজ, মাথা ব্যথা নয়, চোখ ঝাঁঝাঁ নয়।

হাসল। আপন মনে হাসল সুভদ্রা। হাসলে গালে টোল পড়ছে আজো। চোখ দুটো তেমনি সকালের আকাশের মতোই ঝকঝকে। 'আমি শিল্পী, আমি শিল্পী…' গুনগুন করে সমস্ত সত্তা গান করে' উঠল তার। শরীরের সমস্ত লজ্জা যেন সকালের আলোতে পালিয়ে গেছে। ঘটি ঘটি জল ঢাললেই গা থেকে পাঁক ধুয়ে মুছে যাবে। 'আমি শালুক নই, ভাঁট ফুল নই, আমি পদ্ম।'

কাঁধে তোয়ালে আর শাড়ি নিয়ে দরজা খুলল সুভদ্রা।

দরজা খোলার শব্দে হঠাৎ আশপাশ থেকে মেয়ের দল সরে গেল। একেবারে সরে গেল না, আড়ালে-আবডালে থেকে তীর ছুঁড়ল।

উঠোনে নামতেই ছবির গলা কানে গেল সুভদ্রার।

'ওরে পটল দ্যাখ, একরাত্রেই কেমন বড় শিল্পী হয়ে গেছে…'

'জোনাকি নয়, তারকা।'

ভাঙা কাচের মতো হাসির আওয়াজ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ল চারদিকে।

সুভদ্রা থমকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু, না। দ্রুত পায়ে স্নানের ঘরে ঢুকে পড়ল সে।

'বিবির ডাঁট কত! যেন দাঁতে মাছি বসে নি!' ঠোঁট উলটে বললে ছবি।

'দেখেছিস ছবি, আজ সুভদ্রাদি'র চোখে কাজল নেই।' বিন্দু বললে।

'রাত-জাগা কালি পড়লে আর কাজলের কি দরকার ছুঁড়ি!'

স্নানের ঘরের মধ্যে দাঁতে দাঁত এঁটে শক্ত হয়ে রইল সুভদ্রা। সারা শরীর জ্বলছে তার, চোখ ফেটে কান্না গড়িয়ে পড়তে চাইছে। যে ফাঁকিটাকে সে চোখ এড়াবে ভেবেছিল, সেটা যে সকলের চোখে এমন বিশ্রী করে'

রূপ মেবে, কে জানত। ওরা আজ বেড়া ভেঙে তাদের মধ্যে তাকে টেনে আনবেই। সুভদ্রা যেন আজ আর ব্যক্তিগত সুখে-দুঃখে ভরা মানুষ নেই, সে সমালোচনার হাটে দশজনের একজন হয়ে গেছে।

একটা রাত। জীবনের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। একরাত্রেই পাড়ি দিয়ে সে অন্য পারে এসে গেছে। 'ও-পারের সুভদ্রা কাল রাত্রে মারা গেছে শুধু আজ সকালে এ-পারে নতুন সুভদ্রা হয়ে জন্ম নেবার জন্যেই।

'আমি শিল্পী, শিল্পী হতে চাই···' বিড়বিড় করে বললে সুভদ্রা। চোখের জলে আর ঘটির জলে তার চোখ ভিজল, মুখ ভিজল, মাথা ভিজল। যাক—সব ভিজে যাক। তার মন, তার শিল্পী মন শুধু ক্ষুধার্ত শ্বাপদের চোখের মতো জলজল করে' উঠল। বলাইদা' বলেছে আর দেরি নয়, আজ সন্ধ্যেবেলাই সে সাহিত্যিক-পরিচালক সান্যালের কাছে তাকে নিয়ে যাবে, তার বাড়িতে। ভাগ্য বদলাবার তীব্র যন্ত্রণায় সারা বুক জ্বলছে সুভদ্রার, সেই আগুনের শিখার তলায় তার শরীরের লজ্জা পুড়ে খাক হয়ে গেছে।

নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, যত গিলেছে তার চেয়ে বেশি পিঠ পেতেছে। সংসারের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত আগাছা হিসেবেই ভাইবোনের দংগলের মধ্যে বেড়েছে। সংসারের বেগার খাটতে গিয়ে ফুরিয়ে গেছে অনেক ইচ্ছা, ইস্কুলে বই নিয়ে শুধু পড়া-পড়া খেলা করেছে। খাটনির সংসারে শুধু শরীরের শক্তি বেড়েছে, পাড়ার মেয়েদের মধ্যে দৌড় ঝাঁপে কি বছর প্রাইজ পেয়েছে, ইস্কুলের স্পোর্টসে তার নাম সর্বাগ্রে। সংসারের প্রয়োজনের তাপে আর বাইরের তাড়ায় তার মনের গড়নটা অদ্ভুত বেঢপে হয়ে উঠেছে। অনেকটা অতি চালাকের মতো অবস্থা। তাই বলাই ঘোষ ডাণ্টনগঞ্জে পা দিতেই টোপ গিলে নিতে অতি চালাক মাছের মতোই ভুল করতে ভুলল না সুভদ্রা।

মেয়েদের শরীর সম্পর্কে পুরুষের ওৎপাতা ক্ষুধার চেহারা যে সুভদ্রা কোনোদিন দেখেনি, তা নয়। মেয়েদের শরীরটা হচ্ছে দগদগে ঘায়ের মতো, মাছি উড়ে এসে বসবেই। নইলে, তার অত বড় সমাজ-সেবক মামা, দশ বছর যার জেলে কেটেছে, দেশ জোড়া খ্যাতি, চল্লিশ বছর বয়েসে তেরো বছরের বেণী দোলানো খুকি সুভদ্রাকে হঠাৎ মেয়ে মাংসের ডেলা বলে' ভুল করবার কী কারণ থাকতে পারে। মামার লোহার মতো শক্ত আঙুলের চাপে তার ফ্রকের ভাঁজ রক্ষা পায়নি, পরদিন সকালে তার

গালে লাল দাগগুলো দেখে মা যদি মশায় কামড় বলে' ভুল করেন, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বলাই ঘোষ নতুন করে' তাকে আর কী অভিজ্ঞতা দিতে পারে!……

মেনকা না ডাকলে বোধহয় সুভদ্রার ভাবনার জাল ছিঁড়ত না। তাড়াতাড়ি হাত চালাতে লাগল সে।

সারা দিনমান এক অতৃপ্ত অধৈর্যে কাটল সুভদ্রার। দুপুর গড়িয়ে যতই বিকেলের ছায়া ঘন হয়ে এল উঠোনে, অস্থিরতায় দুলে দুলে উঠল বুকের ভেতরটা। প্রথমবার ইস্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে গিয়ে যেমন হয়েছিল। এও তো এক পরীক্ষা—নতুন অধ্যায়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন। ডিরেকটার সান্যালকে কোনোদিন চোখে দেখেনি সে, তার বই পড়েছে ইস্কুল জীবনে। গ্রাম নগর সম্পর্কে কী গভীর দরদ সাহিত্যিকের। তাঁর গল্পের সেই গাঁয়ের মিষ্টি বউয়ের কথা 'বকুল বউয়ের' মুখ আজো তার চোখের সামনে ভাসে। আর বীরভূমের সেই সাঁওতাল দুহিতাদের রসান্বিত জীবন কাহিনী। সান্যালের সংগে সাক্ষাৎকার—যদি তাকে খুশি করতে পারে, বিশ্বাস জাগাতে সমর্থ হয় তাহলে ওর শিল্পী জীবন সুনির্দিষ্ট।

সারা দুপুর অস্থিরতার সংগে অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ভাবে একটি কথাই গুণগুনিয়ে উঠেছে: 'আমি শিল্পী হব, আমি শিল্পী হব…'

বিকেল গড়াতে-না-গড়াতে সাজতে বসল সুভদ্রা। মাথার চুলে সাবান ঘসে ফুলিয়েছে, চুলগুলো আলগা করে' জড়িয়ে নিয়ে গোছার দিকে লাল ফিতের জড়িয়েছে, যেন কালো-বন্যায় আগুনের রক্ত-পুলক। চোখে কাজলের রেখা টেনেছে দীর্ঘ করে', ঠোঁটে লালিমা, কপালে জ্বলজ্বল করছে খয়েরী টিপ। সমস্ত মুখটা স্নিগ্ধ আগুনের মতো দীপ্ত অথচ জ্বালাময় নয়। আর সমস্ত স্বভাবের মধ্যে এক নিকট ঘরোয়া সুর ফুটিয়ে তুলেছে। যেন প্রথম বাসর ঘর ভাঙা কল্যাণী বধূ—চটুল, কিন্তু অশ্লীল নয়।

আয়নায় প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে সুভদ্রা মুগ্ধ হয়।

মুগ্ধ হয় বলাই ঘোষ নিজেও।

'বাঃ তোমাকে যে চেনাই যায় না সুভদ্রা।'

সুভদ্রার চোখে লাস্য। লজ্জা পাবার ভান করে' বললে, 'আপনার কেবল ঠাট্টা…'

'মাইরী বলছি—রাতারাতি তুমি যেন ইয়ে হয়ে উঠেছ…'

'থাক, থাক। আর প্রশংসা করতে হবে না।'

'সত্যি তুমি তাহলে ছবিতে নামবে সুভদ্রা?' বলাই ঘোষের গলায় যেন কী ছিল।

'মানে? বিস্ময় ঘনাল সুভদ্রার চোখের পাতায়: 'শিল্পী হওয়া ছাড়া আমার জীবনে অন্য স্বপ্ন নেই। আমি শিল্পী, শিল্পী হতে চাই··' যেন মন্ত্রোচ্চারণের মতো শেষের কথাগুলো বললে সে।

আয়নার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচল ঠিক করতে লাগল সুভদ্রা।

বলাই ঘোষ পিছনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল মেয়েটিকে। সিফনের হালকা শাড়িটা ওর সমস্ত অবয়বকে লীলায়িত করে' প্রকাশ করেছে। খুঁটিয়ে বিচার করলে সুভদ্রা সুন্দরী নয়, কিন্তু তার সমস্ত সুসমঞ্জস শরীরের মধ্যে এমন এক শান্ত ব্যঞ্জনা ছিল যে দৃষ্টিকে সম্মোহিত না করে পারে না। বলাই ঘোষ রসের বিচারী নয়, মেয়েদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গী স্থূল। আর সুভদ্রার মনোভঙ্গী যেখানে সূক্ষ্ম অতি-চালাকি দিয়ে ঘেরা সেখানে বলাইয়ের রূঢ় হস্তক্ষেপ।

সুভদ্রার পিছনে সরে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল বলাই ঘোষ। সুভদ্রা বাধা দিল না, একবার মুখ ফিরিয়ে হাসল শুধু।

হঠাৎ কেমন খাপছাড়া শোনাল বলাই ঘোষের গলা: 'সুভদ্রা—তুমি ছবিতে নামতে চেয়ো না '

'মানে? আপনি কী যা তা বকছেন? কী বলতে চান আপনি?' উত্তেজনায় জ্বলতে লাগল সুভদ্রার চোখ।

'আমি—আমি বলছিলাম…' দম-ফুরানো যন্ত্রের মতো থেমে গেল বলাই ঘোষ।

'থাক। বুঝেছি।' সুভদ্রা বললে ব্যঙ্গ করে': 'এক রাত্তির আমার বিছানায় শুয়ে আপনি কি ভেবেছেন সারা জীবনের দাবি বর্তে গেছে!… আপনি যদি আমাকে না নিয়ে যান আমাকে একাই যেতে হবে।' দৃঢ় গলায় ঘোষণা করল সুভদ্রা।

বলাই ঘোষ নিজের সম্বিত ফিরে পেল। হো হো করে' হেসে উঠল, তারপর বললে, 'আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম মাত্র।'

'পরীক্ষা!' সুভদ্রাও হাসল : 'পরীক্ষায় পাশ করেছি নিশ্চয়ই।'

'করেছ। চলো বেরোনো যাক।'

মুখের ওপর পাউডারের শেষ ছোঁওয়া বুলিয়ে নিয়ে জয়পুরী ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে বেরোল সুভদ্রা।

শহরের বুকে তখন রোজকার মতো কোলাহল করে' সন্ধ্যা নেমেছে। আর এই উত্তাল কোলাহল সুভদ্রার বুকের দুর্ দুর্ এর সংগে মিশে এক অসহ্য ভালো-লাগার শিহরণ দেয়। দোকানে বিদ্যুত তরঙ্গের হিল্লোল, ট্রাম ছুটছে বাস ছুটছে, হাসি গান রঙ—জীবনের বিচিত্র রসায়ন। চৌরঙ্গী পেরিয়ে, যাদুঘর ছাড়িয়ে, এলগিন রোড পিছনে ফেলে ট্যাক্সি ছুটে চলল। স্বপ্নের মতো দুধারের ছবিগুলো ভেসে-ভেসে গেল।

তারপর গাড়ি এসে থামল এস. আর. দাশ রোডে। একটা দোতলা ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে।

বলাই ঘোষ বললে, 'নাবো—'

শংকিত চরণে নামল সুভদ্রা। এতদূর ছুটে এসে এবার যেন সত্যিই ভয় ভয় করছে। এই ফ্ল্যাট বাড়িরই কোনো এক ঘরে তার পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার হলে ঢুকেও যেমন মেয়েদের মনে হয় একবার নোট বইটা দেখে নিলে হত তেমনি মনে মনেই যেন আশু প্রশ্নপত্রগুলো আউড়ে নিল সুভদ্রা।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলার একটা ঘরে পর্দা ঠেলে ঢুকল ওরা। ঘরে স্নিগ্ধ আলো জ্বলছে, সিলিং ফ্যানটা তখনো পূর্ণোদ্যমে ছুটছে—মনে হল একটু কাজে ভেতরে গেছেন গৃহস্বামী।

জানালার নিচে কৌচটায় বসল দুজনে।

মুহূর্ত কাটছে, আর সারা শরীর অজানা সন্ত্রাসে আর ঘামে গলছে সুভদ্রার। গলার ভেতরটা কাগজের মতো শুকিয়ে যাচ্ছে।

বলাই ঘোষ অপাঙ্গে ওর দিকে চেয়ে হাতে চাপ দিল।

প্রাণপণে উত্তেজনাকে সম্বরণ করবার জন্যে ঘরের চারদিকে তাকাতে লাগল সুভদ্রা।

রবীন্দ্রনাথের মুখটা কি গম্ভীর-থমথমে, শরৎচন্দ্র নিমীলিত নেত্রে যেন ত্রিকাল দর্শন করছেন। একই দেয়ালে একটু নীচে সাহিত্যিক সান্যালের দৃপ্ত মুখচ্ছবি। কিন্তু…এঁরা কি কেউ হাসতে জানেন না, ভয়-পাওয়া লোককে আরো ভয় পাইয়ে দেবার জন্যেই যেন ওঁদের চেষ্টা! আচ্ছা: টেবিলের ওপর গোপাল ভাঁড়ের ছবির মতো মাটির মূর্তিটি কার? ওই একটি মুখ তার শারীরিক বিকৃতি নিয়ে যা একটু হাসি জোগায়। বোধহয় এবার সত্যিই ভাবনার মেঘকে সরিয়ে ফেলে হাসির রঙ-ই লেগেছিল তার মুখে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হবার সময় পেল না।

অন্দরের পর্দা ঠেলে ঢুকলেন সাহিত্যিক-পরিচালক পরিমল সান্যাল।

'এই যে তোমরা এসে পড়েছ—'

বলাই ঘোষ নমস্কার করল।

সুভদ্রা বিহ্বল-বিস্ময়ে তাকিয়েছিল মানুষটির দিকে। হ্রস্ব দেহ। মাথা ভরতি কালো কোঁকড়ানো চুল, চোখে চশমা। পাঞ্জাবী আর পায়জামা, পায়ে হাল্‌কা কটকী চটি।

'আরে এই তোমার সুভদ্রা…?' সান্যালের চোখে গভীর দৃষ্টি।

সুভদ্রা পায়ে-পায়ে উঠে এল সান্যালের কাছে, হেঁট হয়ে প্রণাম করল। তারপর মুখ নিচু করে' দাঁড়াল মূক হয়ে।

'বাঃ বেশ মেয়ে তো। বসো, বসো ভাই। দাঁড়াও আগে মেয়েদের সংগে আলাপ করিয়ে দিই।' সান্যাল উচ্চস্বরে অন্দরের উদ্দেশে ডাক পাড়লেন।

সান্যালের স্ত্রী বছর পঁয়ত্রিশের হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রমহিলা। নাম নমিতা, আর সংগে এল তেরো বছরের কন্যা শীলা।

সান্যাল বললেন, 'এসো—তোমাদের সংগে আলাপ করিয়ে দিই। এর নাম সুভদ্রা। দেখেছ কেমন স্মার্ট মেয়ে। কেমন মনে হয়, চলবে না?'

সুভদ্রা নমিতাকে প্রণাম করল।

তারপর চা সহযোগে ঘরোয়া আলাপের তোড়ে কখন যে ভেসে গেল সুভদ্রা, জানতেই পারল না। বারে-বারে মনে পড়ছিল সুভদ্রার: কী সুখী সংসার এঁদের, স্নেহশীল পিতা, মমতাময়ী গৃহিণী। তুলনায় মনে পড়ছিল অভাবে-ব্যর্থতায়-নিচতায় কলুষিত তার নিজেদের সংসারের কথা। অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল সে।

কী করে' একটি ঘণ্টাই কেটে গেল।

কাজের কথায় এলেন এবার সান্যাল।

'ওরে শীলা, রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতাটা নিয়ে আয় তো।'

বই এল।

সান্যাল সুভদ্রার দিকে ফিরে বললেন, 'শেষেব কবিতা পড়েছ ? পড়োনি ? আচ্ছা ঠিক আছে। এই যে এখানে—লাবণ্যের এই কথাগুলো পড়ে যাও তো—'

পড়বে কী, বই হাতে নিয়ে কাঁপতে লাগল সুভদ্রা, গলা শুকিয়ে গিয়ে ঢোঁক গিলল কয়েকবার।

'পড়ো-পড়ো। লজ্জা কী—বাইরের লোক তো কেউ নেই—' সাহস দিলেন সান্যাল।

চোখ-কান বুজে পড়তে শুরু করে' দিল সুভদ্রা, প্রথমটায় তোতলাতে লাগল, হোঁচট খেলো কয়েকবার, তারপর উচ্চারণ অনেক সহজ হয়ে এল।

চোখ বুজে শুনছিলেন সান্যাল, এবার চোখ খুলে কিছুক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর বললেন: 'উঁহু ঠিক হচ্ছে না। তোমার গলায় একটু পশ্চিমী ঝোঁক আছে, হয়তো বিহারে মানুষ হবার জন্যেই হবে-বা। এই ধরো: ব' য়ে শূন্য র আর ড' য়ে শূন্য ড়। এই দুটোর উচ্চাবণ পবিষ্কাব হওয়া চাই। যেমন: 'জল পড়ে,' 'জল পবে' নয়, আবার ধরো কথাটা: 'বনভূমি'—বাংলায় উচ্চারণে ব'য়ের ওপব এত জোর দেয়া চলবে না, ওটাকে একটু কোমল করে' বলবে 'বোনোভূমি'। কেমন বুঝতে পারলে তো আমার কথাটা ?'

সুভদ্রা মাথা নাড়ল।

'একদিনে আর বেশি মাস্টাবি কবা ঠিক হবে না, কী বলো ?' হাসলেন সান্যাল: 'এক কাজ করো এই বইটা নিয়ে যাও। খুব মন দিয়ে পড়ো কয়েকদিন। আর নিজেকে ভাবতে চেষ্টা করো তুমি লাবণ্য, লাবণ্যের মতো সুন্দর-সাজানো কথা বলতে শেখো, রাত্রে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে লাবণ্যের স্বপ্ন দেখো।...' সান্যাল চেয়ার ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললেন, 'তাহলে ওই কথা রইল। সামনে হপ্তায় বলাই ঘোষকে নিয়ে এসো স্টুডিয়োতে। তোমার কতগুলো স্টীল ফোটো নেবো।'

ফেরার পথে সারা রাস্তা বকবক করে' গেল সুভদ্রা। উচ্ছ্বাসে আবেগে বারবার ঢলে পড়তে লাগল বলাই ঘোষের গায়ে। বলাই ঘোষ মূক, বিকারহীন। অন্য সময় হলে মেয়েলী বুদ্ধিমত্তায় বলাই ঘোষের মনোভাবকে ধরে ফেলতে পারত সে। কিন্তু আজ, তার এই নতুন অভিজ্ঞতার ক্ষণে আর কারুর দরকার নেই। বলাই ঘোষ পাশে না-থাকলেও আপন মনে উচ্ছ্বসিত সূর্যমুখীর মতো মনের দলগুলো মেলে' ধরত সে। জীবনে সাহিত্যিক দেখেনি সে, না-দেখার অপার বিস্ময় ছিল তার চোখেমুখে। ভয়ও ছিল, কিন্তু পরিমল সান্যালকে দেখার পর তার ভয় কেটেছে, ধারণা জন্মেছে। আহা! কী সুখী পরিবার ওরা! সুন্দরী স্ত্রী, সুকুমারী কন্যা। আর চারদিকে ঘরোয়া পরিচ্ছন্নতার চিহ্ন।

বলাই ঘোষ ওকে পৌঁছে দিয়েই চলে গেল। সুভদ্রারও বোধহয় সময় ছিল না বলাই ঘোষকে ডেকে কিছু কৃতজ্ঞতার কথা বলার। না, এক কাপ চা-ও নয়। ছাতে ওঠবার সুযোগের মুখ দেখেছে সুভদ্রা, কী হবে সিঁড়ির কথা মনে করে'।

সারা বাড়িতে তখন দিনশেষের অবসাদ ঘনিয়ে এসেছে। কেমন নিশ্চুপ, আর নিরন্ধ্র। বোধহয় রঙ্গিলা মেয়েরা এখনো স্টুডিয়ো থেকে ফিরে আসে নি। আজকের চোখে এমন বিশ্রী আর বীভৎস রূপে কোনোদিন এ-বাড়ির চেহারাটা ধরা পড়েনি সুভদ্রার। এমন একটা বাড়িতে সে আছে ভাবতেও নিজেকে অবাক হতে হয়। আবার নিজের মনেই সান্ত্বনা খোঁজে সুভদ্রা: শিল্পীর জীবনই বোধহয় এই, পাঁক থেকেই তো পদ্মের জন্ম।

ঘরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকল সুভদ্রা। আলো জ্বালতেই দেয়ালে-টাঙানো আয়নাতে আলো গিয়ে ঠিকরে পড়ল। আয়নার সামনে রোজকার মতো নিজেকে মেলে ধরল সে। একটু রোগা হয়েছে এ' কদিনে, তা হোক, হাসলে তবু টোল পড়ে। চোখদুটো ঝকঝকে সকালের আকাশ—উজ্জ্বল, কোনো ছায়া পড়ে না। ধনুকের মতো বাঁকানো ভুরু, কপালের খয়েরী টিপটা একটুও নিষ্প্রভ হয়নি।

জামা-কাপড় ছেড়ে বিছানায় চিত হবার অবকাশ পেল সুভদ্রা। আমাকে লাবণ্য হতে হবে, লাবণ্যের মতো কথা কইতে হবে, স্বপ্ন দেখতে হবে লাবণ্যকে।......

রাত্রির মৌন বিদীর্ণ হল স্টুডিয়ো-ফেরত মেয়েদের কলগুঞ্জনে।

একটা গোপন কথা গুমরে উঠছিল ছবির পেটের মধ্যে। এতক্ষণ কাজের ভিড়ে বলার ফুরসৎ পায়নি। বাড়িতে ফিরেই চুলকনার মতোই জিভের ডগা খশখশ করে' উঠল ওর।

'অ মেনকা, অ পটল শোন্—'উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফুলে ফুলে উঠল ছবি।

'আ মর ছুঁড়ি। এত হাসি কিসের রে?' ধমক দিয়ে উঠল মেনকা।

ধমকের ধাক্কায় হাসির বেগ আরো প্রবল হল। হি হি—হি হি।

রাগ করে' মেনকা ঘরে চলে যাচ্ছিল, আঁচল টেনে থামাল ছবি। তারপর কোনো রকমে হাসি চেপে খবরটা দেবার চেষ্টা করল: 'দু' নম্বর স্টুডিয়োতে—বিষ্টুপিয়া ছবি হচ্ছে—ফলি মিস্ত্রী বলছিল—হি হি—হি হি—' হাসির দাপটে বিপর্যস্ত বোধ করল ছবি, প্রাণপণে হাসির রাশকে টেনে ধরে শেষ করল সে: 'ফলি মিস্ত্রি বলছিল—হি হি—সেখানে সেটের মধ্যেই নিমাইপণ্ডিত নাকি বিষ্টুপিয়াকে···হি হি--হি হি—'

'তোর যত নরক-ঘাঁটা গল্প! দেড়কুড়ি বয়েস হতে চলল, লজ্জা করে না তোর?' মেনকা পা বাড়াল।

'আহা আগে শোনই না—'একটু দম নিয়ে ছবি বললে, 'পড়বি তো পড়্—ডিরেকটারের চোখে পড়ে গেছে—ডিরেকটার কী বলেছে ওদের জানিস? হি হি! বলেছে: তোমরা ধম্মের পাট করছ, কোথায় ধম্মের ভাব আনবে, না একী বেলেল্লাপনা! হি হি—হি হি।' বলা বাহুল্য: ডিরেকটারের কথাটা ছবির স্বকীয় ভাষ্য।

মেনকা মুচকে হেসে চলে গেল।

পটল ছবিকে একান্তে টেনে নিয়ে গিয়ে কৌতূহলে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল: 'মাইরি, সত্যি খবর বলছিস?'

'মাইরি—মাইরি—মাইরি। এবার বিশ্বাস হল?'

'সাবধানে থাকিস লো।' চোখ মটকে বললে পটল: 'যা ঢলাঢলি আরম্ভ করেছিস ফলি মিস্ত্রির সংগে।'

ছবি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর ফিশফিশ করে' বললে, 'ফলি আমাকে বে' করতে চেয়েছে।'

পটল যেন আকাশ থেকে পড়ল। গালে হাত দিয়ে অবাকের ভঙ্গী

করে' বললে, 'ওই ট্যারা বেঁটে-বাঁটকুল তোবড়া-মুখো ফজিকে তুই বে' করবি ।' দম নিয়ে বললে আবার : 'জানিস পোড়ামুখী, ও মোছলমান...'

ছবি গম্ভীরমুখ করে' বললে, 'জাত কী আর গায়ে লেখা থাকে ? আর আমি নিজেই তো বেজন্মা, আমার আবার জাত কি যে, ছুঁড়ি ?' তারপর রাত্রির তাল-তাল অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে মৃদু গলায় বললে সে : 'জন্মে তক আমার মার ঘরে রোজ রাত্রে এত মানুষ দেখেছি, কাউকে 'বাবা' বলে' ডাকতে পারিনি । আমি চাই আমার ছেলেমেয়ে তাদের বাবাকে ঠিক চিনতে পারবে ।'

অন্ধকারে ঘরের মধ্যে মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিল পটল ।

কানের পর্দায় কেবল আওয়াজ তুলছে ছবির কথাটা । তার মনেই কী একদা এরকম একটা ইচ্ছা বাসা বেঁধে ছিল না ? জয়নগর মজিলপুর থেকে রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারী, উত্তর কলকাতার এক হাসপাতালের আন-ট্রেণ্ড্ নার্শ । এমনি একদিন ট্রেণপথে বারুইপুর স্টেশনে লঘু ঝগড়ার মধ্যে দিয়ে আলাপ হয়ে গিয়েছিল সুকেশ চৌধুরির সংগে । সুকেশ বোধহয় সীট্ ছেড়ে একবার বাইরে গিয়েছিল চা খেতে আর সেই অবকাশে পটল এসে জানালার কাছের সীটটা দখল করেছিল । ফিরে এসে গণ্ডগোল করেছিল সুকেশ, কিন্তু কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল পটলের, সীট ছাড়েনি । ফেরিঅলা ডেকে পান কিনেছিল । মুখোমুখী বসেছিল দুজনে । একটা দুটো বাক্য বিনিময়ও হয়েছিল । সুকেশের প্রশ্নের ভঙ্গিটা অসভ্য রকমেরই ছিল, সে জিগ্যেস করেছিল : 'বিয়ে না-করে' নার্শিং লাইনে কেন ?' পটল রাগেনি, হেসে বলেছিল : 'ছেলে আছে, আমার বোন সুশীলার জন্যে একজন ঠিক করে' দিন না । আমার মতো রোগা-পাটকাটি নয়, সুন্দরী । কুড়ি বছরে প'ড়লো । বোনের বয়েসের কথা উল্লেখ করে' নিজের বয়সেরও আভাস দেবার চেষ্টা করেছিল সে । আর বিয়ে করতে না-পারার কারণটাও ।

মনে পড়ছে...ট্রেণের কামরায় সেই দৃশ্যটা । গাড়ি এসে থেমেছে শেয়ালদা' স্টেশনে । হুড়মুড় করে' নামতে লাগল ব্যস্তবাগীশ যাত্রীর দল ।

পটল ইচ্ছে করেই পেছনে পড়েছিল শুধু সুকেশকে তার পিঠের ওপর ঘনিয়ে আসবার সুযোগ দেবার জন্যে। সুকেশের সর্বশরীরের তাপ ছিল পটলের ঘেমো পিঠ-কোমরের ওপর। তারপর···যা হয়ে থাকে। কখনো বৌবাজার মোড়ে, প্রাচী সিনেমার গায়ে, মৌলালির পানের দোকানের সামনে, কোনো-দিন কোনো হোটেলের কেবিনে, কোয়ালিটি রেস্তোরাঁয়, অফ-ডে'র দুপুরে লাইট হাউসের আধা অন্ধকারে, এলিটের ব্যালকনিতে, ভিক্টোরিয়া মেমো-রিয়ালের কুঞ্জে। বিবাহ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পটলকে যেন কিনে ফেলল সুকেশ। হোটেলের সেই সস্তা ভাড়ার ঘরগুলিতে আসন্ন দাম্পত্য-জীবনেরই রিহার্সাল দিচ্ছিল ওরা। তারপর একদিন হারিয়ে গেল স্বপ্ন-দেখার দিনগুলি। হঠাৎ উধাও হল সুকেশ। একদিন নয়, দুদিন নয়—একমাস। ওর দেয়া ঠিকানায় ডালহৌসির অফিসে খোঁজ নিতে গিয়ে জেনেছিল: সুকেশ চৌধুরি নামে সেখানে কেউ কাজ করে না।··· সুকেশ তাকে মিথ্যে ঠিকানা দিয়েছিল। ঘা খেয়ে শিক্ষা হয়নি পটলের। এরপরেও কতবার কলকাতার পথে ঘাটে বর খুঁজে ফিরেছে, হাসপাতালের কম্পাউণ্ডারের যোগসাজসে ওষুধ পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়বার পর, চাকরি গেল তার, না এল বর, না রইল চাকরি। পেল বলাই ঘোষকে। বেঁচে গেল, বেঁচে গেল পটল।······

আরো রাত্রি ঘনিয়ে এল।

সমস্ত বাড়িটা নিশ্চুপ হয়ে এসেছে।

কিন্তু একটু কান খাড়া করলেই শোনা যেত বিন্দুর ঘরের চাপাকণ্ঠের ফিশফিশানি। ওর বর এসেছে। যুগল শয্যায় শুয়ে বোধহয় দাম্পত্য-জীবনের স্বপ্নই ঘনাচ্ছে বিন্দুব চোখে। স্বামী নিবারণের মুখে আজ গন্ধটা তীব্র হলেও ক্ষতি কী। পুরুষমানুষ না হয় একটু মদ খেয়েছে। শুধু মদ নয়, আর একটু খুঁটিয়ে দেখলে নিবারণের শরীরে পচা রক্তেরও গন্ধ পেত বিন্দু।

ভোরবেলা হঠাৎ পুলিশ হানা দিল বাড়িতে। বিন্দু আর দশজনের চোখের সামনে দিয়ে ধরে নিয়ে গেল নিবারণকে। গ্রে স্ট্রীটের কোন্ এক গণিকাকে খুন করে' তার টাকা পয়সা চুরি করে নাকি গা ঢাকা দিয়েছিল নিবারণ।

বিন্দুর চোখের জলে সকাল এল। কাঁদতে-কাঁদতে হঠাৎ ভুলে যায় বিন্দু আসলে কাঁদছে সে কিসের জন্যে। শিশুরা কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ চোখের সামনে কোনো খেলনা দেখলে ভুলে যায়, তেমনি আসল কান্নার

বাষ্পটা বাধা পেল বিন্দুর, চোখের সুমুখে ভেসে উঠল সেই পুকুর পাড়ে মাথা দোলানো নারকেল গাছ, আর সেই নারকেল গাছটার কথা ভে তার সারা মন হুহু করে' উঠল।

কান্না বাধা পাবার কারণও মুখ্যত মেনকা।

ধমকে উঠে বললে, 'পোড়ামুখী কাঁদতে লজ্জা করে না? ঘরে মে মানুষ থাকতেও যে পাজিটা অন্য মেয়েমানুষের সঙ্গে নষ্টামি করতে যা তার জন্যে তুই কাঁদিস?'

'কী করব ভাই, ওযে আমার সোয়ামী…'

'মুখে নুড়ো জেলে দিই অমন সোয়ামীর। বুঝলি চোকখাকি, তো মিনমিনে স্বভাবই ওকে বজ্জাত করে' তুলেছে। একটু শক্ত হাতে হা ধরতে পারিস নি।'

'পারিনি। আজ আর বললে কি হবে ভাই।'

'মর্ মর্, মর্ তুই—'

বিন্দু ধরা গলায় বললে, 'মরতে চাইলেই কি মরা যায় ভাই আর মরেও কি পার আছে। পরজন্মেও তো ওর দাসী হয়ে সেবা করতে হবে। আমার দিদিমা বলত…'

'চুপ কর্ বলছি। তোর গেঁইয়া গল্প ঢের শুনেছি'—দ্রুত পায়ে বিদা হল মেনকা।

বিন্দুও দাঁড়াল না। গামছা শাড়ি কাঁধে স্নানের ঘরের উদ্দেশ্যে রওন হল। আজ সকাল সকাল শুটিং আছে। অন্য মেয়েদের পরে গেলেও চলতে পারে, কিন্তু তার আগে যাওয়া দরকার।

ছবি সুভদ্রার ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মারছিল। এখনো পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে বুঝি মেয়েটা। হ্যাঁ ঘুমোচ্ছেই। কী আশ্চর্য, দরজাটা ভেজানো, বোধহয় শেষ রাত্রের দিকে বেরোনোর প্রয়োজন পড়েছিল। দরজাটা আস্তে ঠেলতেই খুলে গেল। সমস্ত ঘরটা এবার দেখা যাচ্ছে। সস্তা আলনায় বেশ পরিপাটি করে' গুছোনো শাড়ি। সিল্ক, মুর্শিদাবাদী, ধনেখালিও কী একটা থাকবে না? আর ওই ধনেখালি শাড়ি পরার যে কত শখ ছবির! আহা, সুভদ্রা যদি তার বন্ধু হত! পায়ে-পায়ে এগিয়ে গেছে সে ঘরের মধ্যে। হঠাৎ প্রকাণ্ড আয়নাটার ওপর চোখ পড়ল। ইশ! কত বড় আয়না!

মাথা দুলিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে হাজার বার চুল খোলো চুল বাঁধো। শাড়ি বারবার খোলো, আর পরো। মুখ দেখো যত খুশি। সুভদ্রা কি তার চেয়ে বেশি সুন্দরী! বলাই ঘোষ তো সেদিনও অন্য কথা বলেছে, সুভদ্রা এ-বাড়িতে আসবার আগে। আর ফলি মিস্ত্রি! কী যেন গুনগুন করে গাইছিল সেদিন: 'তুমি হও গহিন গাঙ আমি ডুব্যা মরি।' কথাটা কী সত্যি-সত্যি বলেছিল ফলি, নাকি মস্করা করছিল। না, মস্করা নয়, তাহলে সে কি বিয়ে করতে চাইত তাকে। বিয়ের সময় কী একখানা ধনেখালি শাড়িও সে উপহার দেবে না? ওই যে সুভদ্রার আলনায় টাঙানো খয়েরী রঙের শাড়িটার মতো। আচ্ছা কেমন মানাবে, দেখাই যাক না। শাড়িটা আলনা থেকে টেনে নামাল ছবি। তার পরনের আট পৌরে শাড়িটা ছেড়ে ফেলল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরেও ফেলেছিল শাড়িটা, হঠাৎ পেছন থেকে ঘুম ভাঙা গলায় চিৎকার করে' উঠলো সুভদ্রা: 'চোর—চোর—চোর···'

এতক্ষণে চমক ফিরল ছবির। কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। শাড়িটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেলাই উচিত ছিল, কিন্তু আয়নায় প্রতিবিম্বিত শাড়ি-বেষ্টিত তার শরীরের দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল সে। যেন পেরেক দিয়ে তার পা দুটো কে মাটির সঙ্গে পুঁতে দিয়েছে।

চিৎকারে বস্তির মেয়েরা ভেঙে পড়ল সুভদ্রার ঘরে। মেনকা, পটল, বিন্দু—সকলেই।

'ছবি—তুই!'

সুভদ্রা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। 'চোর, চোর, আমার শাড়ি চুরি করে' পালাচ্ছিল। আমি পুলিসে দেবো।'

মেনকা কঠিন স্বরে বললে, 'চুপ করুন। এত চেঁচাচ্ছেন কেন?'

সুভদ্রা উত্তেজিত গলায় বললে, 'চেঁচাব না মানে? আমার শাড়ি চুরি যাবে, আর আমি চুপ করে' থাকব।'

'আপনার শাড়ি চুরি হয়নি মোটেই। ছবি, খুলে ফেল শাড়ি···' মেনকা ধমক দিয়ে উঠল।

অতি সহজেই ছবি শাড়ি খুলে ফেলল।

'যা বেরিয়ে যা ঘর থেকে।' মেনকা হুকুমের গলায় বললে ফের।

সকলেই বেরিয়ে আসছিল, পেছনে ডাকল সুভদ্রা।

'শোনো—'

মেনকা ফিরে দাঁড়াল।

সুভদ্রা বললে, 'কী ভেবেছ ওর ছাড়া শাড়ি আমি গায়ে তুলব।'

মেনকা বললে, 'বেশ তো। আমি কেচে এনে দিচ্ছি।'

'না।'

'তবে?'

'আমি কারুর এঁটো শাড়ি পরি নে—'

পটল ফশ্ করে বলে' ফেলল: 'কেন আমরা বেবুশ্যা বলে'! তবু যদি জানতাম এঁটো পাতে খাননি।'

'অসভ্য, ইতর...'

'তা হবে—' ব্যংগ করে' বললে পটল: 'বুঝলাম শাড়ি কাচলেও শুদ্ধ হয় না. কিন্তু শরীর এঁটো হলে ধুলেই পরিষ্কার হয়ে যায়, তাই না?'

'চুপ কর্ পটল—চল্—'

'আসুক বলাইদা—' দাঁতে দাঁত এঁটে অস্ফুটে বললে সুভদ্রা।

বলাই ঘোষ অবশ্য মনোযোগ দিয়েই শুনল সমস্ত ঘটনাটা। শুনে দার্শনিকতার সুরে বললে, 'নর্দমা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে তার গন্ধ নাকে এসে লাগবেই। বুদ্ধিমান মানুষ তার থেকে দূরে থাকবে।'

সুভদ্রার সারা মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো কালো আর ভারি হয়ে উঠল, কিছু বলল না।

সাজঘরে সাজ করতে-করতে কি মুখে রঙ মাখতে-মাখতে বিন্দুর মন কেবল পাখা মেলে উড়ে যেতে চায়। যতবার হাল্কা করতে চেয়েছে মনকে ততবারই কাঁচা অভিনেত্রীর মতো তার মনের খেই হারিয়ে যাচ্ছে। স্বামীর মুখ ভাসছে চোখের পাতায়, আর হাওয়ায়-দোলা-লাগা নারকেল গাছের মাথা কাঁপছে থরথর করে'। একটু ক্লান্তিহীন ভাবে একলা-একলা যদি কাঁদতে পারত, যেমন করে' কেঁদেছিল দেশের মাটি ছেড়ে আসতে-গিয়ে। কলকেতায় পা দিয়ে। কিন্তু আগের মতো কান্নার ইচ্ছাটুকুই

কেমন ক্ষয়ে যাচ্ছে মন থেকে। বৃদ্ধ প্রবীণ শহরটা যেন একেবারে হ্যাঁচকা টানেই রাতারাতি তাকে অভিজ্ঞ পাকা করে তুলছে।

সেটে দাঁড়িয়ে ডিরেক্টার বোস শেষবারের মতো সমস্ত পরিস্থিতি বিন্দুকে বুঝিয়ে দিলেন। বস্তির একটা ঘরে নকল স্বামী-স্ত্রীর অভিনয়। স্ত্রীর মাথায় একটু ছিট্। স্বামী রাত্রে ঘরে ফিরে এসে একটা কথা বলবে, আর তাই শুনে খিলখিল করে' পাড়াজাগানো হাসি হেসে উঠতে হবে তাকে।

'নাও—রেডি—'

সমস্ত সেটটা নিস্তব্ধ। একসঙ্গে হাজার পাওয়ারের বাতিগুলো জ্বলে উঠল। রাত্রির এফেক্ট আনতে হবে। ক্যামেরার চোখ ঘুরছে, মাইকগুলো টেনে নামানো হয়েছে নিচে।

এতদিনকার রিহার্শাল-দেয়া শানানো হাসিটা যেন হঠাৎ বুক থেকে আর কিছুতেই ঠেলে বেরোতে চাইল না। এতদিনকার সহজ-হয়ে-আসা, অভ্যাসে ধারালো হয়ে-ওঠা হাসিটা কেমন চিত্তের মধ্যেই গুমরে উঠতে লাগল। ঘামতে লাগল বিন্দু, সমস্ত মুখের ভেতরটা পাঁচন-গোলার মতো বিস্বাদ, যতবার হাসিটাকে ঠেলে দিতে চেষ্টা করেছে কে যেন চেপে ধরেছে শক্ত করে' তার মুখ, লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে সব কিছু, স্বামীর মুখ আর নারকেল গাছের মাথা-দোলা সব গুলিয়ে দিচ্ছে।

ডিরেক্টার বোস চিৎকার করে' উঠলেন। টেকিং বন্ধ হয়ে গেল। 'কী ব্যাপার কি? হাস—হাস। এই এমনি করে—'প্রক্রিয়াটা আবার দেখিয়ে দিলেন পরিচালক।

ফ্যালফ্যাল করে' চেয়ে রয়েছে বিন্দু। কিছু ভাবতে পারছে না, কিছু বুঝতে পারছে না।

হাসিটা বুক থেকে ঠেলে উঠে জিভের আগায় পৌঁছতে-না-পৌঁছতে হারিয়ে যাচ্ছে।

ডিরেক্টার বোস আবার ধমকে উঠলেন: 'নাও—রেডি—'

হঠাৎ এক মরীয়া উত্তেজনায় মাতোয়ারা হয়ে উঠল বিন্দু, সারা মুখ বিস্ফোরণের আগে থমথমে হয়ে এসেছে। ডিরেক্টার বোস মানুষ চড়িয়ে খান, সুযোগ উপস্থিত, ইঙ্গিতে তৈরি হয়ে উঠল টেকনিসিয়ানরা। বিন্দুর নকল স্বামী এসে তার সংলাপ শেষ করেছে। আর পরক্ষণেই একটা আর্তনাদ, না হাসির বিকট আওয়াজ—উদ্‌ভ্রান্ত, বেপরোয়া, মুখে আঁচল দিয়ে ফুলে

ফুলে হাসছে বিন্দু, হাসির দমকে কাঁপছে সারা শরীর। হি হি—হি হি—হি হি।

'কাট্—' ডিরেকটার চিৎকার করে' উঠলেন। মুহূর্তে টেকিং বন্ধ হয়ে গেল।

'ইউনিক! অপূর্ব!' বিন্দুর পিঠ চাপড়ে দিতে এসে আশ্চর্য হয়ে গেলেন পরিচালক, তখনো ফুলে ফুলে হাসছে বিন্দু—বেপরোয়া, বেসামাল। আরে, পাগল হয়ে যাবে নাকি মেয়েটা।

ক্যামেরাম্যান বিজয়েশ দাশ হঠাৎ বিন্দুর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'মেয়েটা হাসছে না মিঃ বোস, কাঁদছে।'

মিঃ বোস বললেন. 'হোয়াট! কেন, কে কাঁদতে বলেছে ওকে?'

বিজয়েশ বললেন, 'একই ব্যাপার স্যার। কান্না আর হাসির এফেক্ট একই হবে। দর্শক ধরতে পারবে না।'

'আই সী। চমৎকার উপস্থিত বুদ্ধি তো মেয়েটির। কান্না দিয়েই হাসিটা ম্যানেজ করেছে···'

সাজঘরে ফিরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিজেরই চিনতে অসুবিধে হয় বিন্দুর। চোখের জলে গালের রঙ আর চোখের কাজল ধুয়ে গেছে, এতক্ষণ লাইটের সামনে দাঁড়িয়ে দারুণ গরমে গলগল করে' ঘামের নদী বইছে সারা শরীরে।

অন্নদা মালি বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে হেসে বললে, 'তুই দেখালি বটে মেয়ে! একেবারে পাকা 'হিরোন' হয়ে গেলি···আমাদের সুনেত্রা দেবীর মতো···ভালো কাঁদতে পারে বলে' যার খুব নাম···কান্নার সিন্ হলেই মুখে আঁচল গুঁজে হি হি করে হাসতে থাকে সে, মনে হয় কাঁদছেই বুঝি···'

বিন্দু চুপ করে' রইল। অভিনয়, অভিনয়! সত্যিকারের কান্না পেলেও সবাই ভাবে এও এক অভিনয়!

জামা-কাপড় ছেড়ে দিয়ে ঘরোয়া পোশাক পরে' ফেলল বিন্দু। আজ আর কোনো কাজ নেই। বাড়ি ফিরে গেলেই হয়। কিন্তু, কী হবে বাড়ি ফিরে। তার চেয়ে ওরা আসুক, একসঙ্গেই ফিরবে।

'আচ্ছা অন্নদাদা, দমদম জেলটা কোথায়?'

'কেন রে ?' অন্নদা হেসে বললে, 'জেলখানায় কেন ?'

'আমায় একদিন নিয়ে যাবে অন্নদাদা ?'

'বুঝেছি—' অন্নদা হেসে বললে, 'আচ্ছা : যাব একদিন নিয়ে। সেইজন্যই বুঝি কানছিলি ?'

বিন্দু কিছু বলল না। জানালায় বাইরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে মৌন হয়ে রইল।

তারপর সন্ধ্যা গড়িয়ে বাত্রি এল। রাত্রি নেমে এল বিন্দুর সারা মনের রাজ্যে যেমন কবে' পায়ে-পায়ে ঝুরি-নামা বটগাছের তলায় অন্ধকার নেমে আসে। আর মূল গুঁড়িটাই বায় হাবিয়ে। তেমনি করে' আসল চিন্তার সূত্রটাই অসংখ্য ঝুরি-নামা অন্ধকারেব অরণ্যে লোপ পেয়ে যায়।

বোধহয় ঘুমিযে পড়েছিল সে, মেনকা এসে ডাক না-দিলে তন্দ্রা টুটত না।

'চ' গাড়ি এসেছে—'

চোখ বগড়ে উঠে দাঁড়াল বিন্দু।

গাড়িতে অন্য মেয়েবা আগেই উঠে বসেছে। ওরাও উঠে পডল। গাড়ি স্টার্ট দেবে, হঠাৎ খবর এল একটু দেবি কবতে। ড্রাইভার রামকিষণ নিশ্চিন্ত মনে একটা বিড়ি ধবাল।

একটু পবে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন ডিবেক্টাব বোস। পেছনে হিরোইন সুনেত্রা দেবী।

'এই মেয়েরা তোমরা নেমে পড তো—' ডিবেক্টাব বোস বললেন, 'তোমবা পবে যাবে। বামকিষণ, সুনেত্রা দেবীকে এই গাড়িতে বাড়ি পৌছে দিয়ে এস। ওঁব গাড়ি এখনো এসে পডে নি।'

রামকিষণ বোকাব মতো বললে, 'দেবীজি আসুন না, জায়গা তো আছে। উনিকে আগে নামিয়ে দিয়ে মেয়েদেব পৌছে দেবো।'

মিঃ বোস কিছু বলবাব আগেই সুনেত্রা দেবী গর্জে উঠলেন, 'জাস্‌ট সী মিঃ বোস—আমি—আমি এই এদের সঙ্গে এক গাড়িতে যাব !'

'না না তাকি হয়—' ডিরেক্টাব বোসেব তোতলানোতে বোঝা গেল এইরকম একটা প্রস্তাব তিনি আগে দিতে গিয়ে অপদস্থ হয়েছেন। 'কই, মেয়েরা নেমে পড়ো।'

হুড়মুড় করে' সকলে নেমে পড়ল।

সুনেত্রা দেবী গাড়িতে উঠে বসলেন, ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে আয়না দেখে পাফ্‌টা একবার মুখময় বুলিয়ে নিলেন, দু' আঙুল নাচিয়ে ডিরেক্টারের উদ্দেশে টা টা করলেন, গাড়ি ছেড়ে দিল।

ডিরেক্টার ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে অন্তর্হিত হলেন।

পটল বললে, 'কাণ্ডখানা দেখলি মেনকা?'

মেনকা না-বোঝবার ভান করে' বললে, 'কি?'

'আমরা বেবুশ্যা কিনা, আমাদের সঙ্গে যেতে ওঁর জাত যায়।'

মেনকা ক্লান্ত গলায় বললে, 'দুঃখ করিস কেন। রামকিষণ তো ওকে আর আমাদের চিনতে ভুল করে নি!'

সেদিন অনেক রাত্রি হল ওদের বাড়িতে ফিরতে।

উঠোনে পা দিতেই দেখল শোভার ঘরে আলো জ্বলছে। হুড়মুড় করে' সকলে ভেঙে পড়ল শোভার ঘরে।

মলিন তক্তপোশের বুকে মিলিয়ে-যাওয়া-শরীর—এই কি শোভা মাসি? গর্তে-ডোবা চোখের চারদিকে পুরু কালি, মাথার চুল উঠে গেছে, মাঝখানে টাক বেরিয়ে পড়েছে।

'মাসি—অ মাসি—' মেনকা ডাকল মৃদু গলায়।

শোভা চোখ খুলল। ফ্যাকাসে, নীরক্ত দৃষ্টি। তারপর উঠতে চেষ্টা করল, পারল না। চাদরের আড়ালে সমস্ত নিম্নাঙ্গ কেমন অসহায়ভাবে থরথর করে' কেঁপে উঠল কয়েকবার। কী-একবার বলবারও চেষ্টা করল সে, কিন্তু গলার স্বর কেমন অস্পষ্ট, ভাঙা-ভাঙা ঠেকল।

'কী হয়েছে? অ মাসি—কথা বলছ না কেন?' আর্তনাদ করে' উঠল মেনকা। তার চোখের সামনে দুলে উঠল তার চিররুগ্না গ্রহণী রোগে শয্যাগতা দিদির চেহারা। বাড়ি-খাওয়া সাপের মতো যে আর একদিনও কোমর তুলতে পারল না।

'বো—স—' ভাঙা-ভাঙা গলায় চোখের ইংগিতে জানাল শোভা। জানাল থেমে-থেমে, দম নিয়ে-নিয়ে, আর কোনোদিন কোমর সোজা করে' দাঁড়াতে পারবে না সে, মরবার কথা ছিল। ডাক্তার বাঁচিয়েছে শুধু কোমর ভেঙে

সারা জীবন বিছানা আঁকড়ে থাকবার জন্যে। পক্ষাঘাতে নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে তার।

স্তম্ভিত হতবুদ্ধির মতো শোভার দিকে চোখ আটকে গেছে মেনকার। কোনোদিন কাঁদেনি, নিজের দুঃখে নয়, এমন কি পরের জন্যেও নয়। কিন্তু আজকে—নিজের জন্যে নয়, পরের জন্যেও নয়, তারও অতীত, সমস্ত অন্ধকার ভবিষ্যতের নরকের দরজা যেন চোখের সামনে খুলে গেল। সেই নরক আজ-হোক কাল-হোক পদ্মার ঘূর্ণির মতো সকলকেই সে দিকে আকর্ষণ করবে, করছে।

বলাই ঘোষ রাত্রেই খবর নিতে এসেছিল। সব শুনে, সব দেখে মাথা নেড়ে বললে, 'এমন হবে আমি জানতাম। এছাড়া শোভার মতো মাগিদের অন্য কিছু হতে পারে না।···কিন্তু, আমি কী করব বলো? একটা অনাথ আশ্রম টাশ্রম খুঁজে নিক ববং। দু' একদিনের বেশি তো আমি এখানে আর পুষতে পারব না।'

অন্ধকার পরিস্থিতিকে আরো অন্ধকার করে' দিয়ে বলাই ঘোষ বিদায় হল।

পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমল মেয়েদের মনে। দাওয়ার ওপর পা ছড়িয়ে চুপ কবে' বসে রইল ওরা। বহুক্ষণ।

তারপর পটল মুখ খুলল। বললে, 'শোভামাসিকে বাঁচাতেই হবে।'

'বাঁচাতে হবে···' সকলের মনে একই ধুয়া।

কিন্তু কী কবে?

পটল বললে, 'আমরা চাঁদা তুলে বাঁচাব ওকে।'

চাঁদা তুলে! সত্যিই তো, এমন সহজ উপায় কারুর মনে জাগেনি।

বিন্দু দ্রুতপায়ে ঘরে গিয়ে একটা টিনের কৌটো নিয়ে এল। কৌটোর ঢাকনিটা ক্ষিপ্রহাতে ছুরি দিয়ে পয়সা-চালানেব মতো ফুটো করে' ফেলল পটল।

হাতের ছোট্ট ব্যাগ থেকে একটি আধুলি বের করে' প্রথম চাঁদা দিল বিন্দু। বিন্দু যদি দিল, অন্যেরা পেছনে পড়ে' থাকবে কেন, সকলেই সাধ্যমতো কিছু কিছু গলিয়ে দিল কৌটোর মধ্যে।

'ছবি তুই দিলি নে?' পটল কৌটো এগিয়ে দিল তার সামনে।

ছবি কি যেন ভাবছিল, ইচ্ছে থাকলেও হাতের মুঠো যেন কিছুতেই

খুলছিল না তার। অন্য সময় হলে এত দোনামনা হত না হয়তো। কিন্তু নিকট-ভবিষ্যতের দ্বৈত-জীবনের কথা ভেবে টাকা-জমানোর প্রতি একটা মরীয়া ঝোঁক চেপে বসেছিল তার। কিন্তু, শোভা মাসির বর্তমানটা এত নিষ্ঠুর সত্য যে চোখ উলটে থাকা যায় না; চিন্তিত মনেই একটা সিকি বের করে' দিল অগত্যা।

বিন্দু বললে, 'সুভদ্রাদি'র কাছে চাঁদা চাইতে হবে।'

মেনকা ঘাড় নেড়ে বললে, 'না। ওতো আমাদের কেউ নয়। আমরা যতদিন আছি, ভিক্ষে করে' মাসিকে বাঁচতে দেবো না।'

চাঁদা তুলে বাঁচাবার হাস্যকর পরিকল্পনায় বা যে কোনো কারণেই হোক, এর দু'চারদিন পরে সন্ধ্যেবেলা স্টুডিয়ো থেকে ফিরে এসে শোভা মাসিকে আর পাওয়া গেল না বাড়িতে। মেনকা কাঁদল অনেকক্ষণ, অন্য মেয়েরাও বিচলিত হল। কেউ কেউ অজ্ঞাত কোনো ভাগ্য দেবতার উদ্দেশ্যে শাপমন্যি করল।

তারপর আরো দিন গড়িয়ে চলল।

নির্দিষ্ট দিনে বলাই ঘোষকে ভর করে' স্টুডিয়োতে হাজির হল সুভদ্রা। ড রেক্টার সান্যাল সেটে ব্যস্ত ছিলেন, অপেক্ষা করতে হল সুভদ্রাকে। ডিরেক্টারের ঘরে চুপ করে' চেয়ারে বসে রইল সুভদ্রা। ছোট্ট ঘর। সারা দেয়ালে অভিনেত্রীদের ছবি—দেশী-বিদেশী কত-জানা কত নাম-না-জানা শিল্পীদের ফোটো। কেউ হাসছে, কেউ সৌম্য, কারুর চোখে লাস্য। সুভদ্রার চোখে যেন স্বপ্ন দুলতে থাকে—ওই দেয়ালে একদিন তারও ফোটো বিজয়িনী হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে।

সি লিঙ ফ্যানের আওয়াজে সময়ের চাকা ঘুরতে থাকে।

কতক্ষণ একলা এই ভাবে বসে থাকতে হবে, কে জানে।

বলাই ঘোষ এসে বললে, 'একটু দেরি হবে। তুমি অপেক্ষা করো। আমি পরে এসে নিয়ে যাব তোমাকে।'

বলাইদা ছিল, তাও এক ভরসা। এবার সম্পূর্ণ অপরিচিত আবেষ্টনীতে

পড়ে' নার্ভাস বোধ করতে লাগল সুভদ্রা। শুধু নার্ভাস নয়, তার ধৈর্যও পীড়িত হতে লাগল।

জানালার বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার জাঁকিয়ে বসেছে। পেছনের আম-নারকেল-কলা বাগান থেকে ঝিল্লীরব শোনা যাচ্ছে। একটু কান পেতে রাখলে শেয়ালের ডাকও চিনতে ভুল হয় না।

আবার বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল সুভদ্রা। দেয়ালের ফোটোগুলোর ওপর আবার চোখ বুলিয়ে নিল। সামনের টেবিল, টেবিলের পরে ফাইলের স্তূপ, এলোমেলো কিছু নেগেটিভ···একবার সোজা হয়ে, একবার কাত হয়ে, টেবিলে দেহভার ঝুঁকিয়ে একঘেয়েমির মধ্যে বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করল। তারপর মনে হল কপালে ঘামের ফোঁটা, মুখের পাউডারের আস্তরণ বোধ করি ধুয়ে মুছে যাচ্ছে, ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে আয়না বা'র করে' পাউডারের পাফটা একবার বুলিয়ে-নেয়া। তারপর কাজের অভাবে আঙুলের নিখুঁত করে' কাটা নখগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা। তারপর আবার দেয়ালের ছবি-দেখা···সমস্ত ঘরটা যেন মুখস্থ হয়ে গেল তার। চোখ দুটো ব্যথা করছে, অলসতায় জড়িয়ে আসছে ভারি হয়ে, কোমর টনটন করছে, টেবিলে মাথা রেখে কেমন ঝিমুনি পাচ্ছে···

ব্যস্ত পায়ে ডিরেক্টার সান্যাল একবার ঘরে এসে ঢুকলেন।

'একটু বসতে হবে ভাই। ভীষণ ব্যস্ত।' বলেই আবার হুড়মুড় করে' তিনি অন্তর্হিত হলেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল সুভদ্রা, সমস্ত দেহে উৎসাহের আগুন জ্বলে উঠেছিল, আবার দম-হারানো পুতুলের মতো ধপ্ করে' বসে পড়ল চেয়ার আঁকড়ে। আবার দেয়ালে ফোটো গোনা, এক দুই তিন—হাসি, লাস্য, কৌতুক···এক দুই তিন···দেয়াল থেকে ঘরের চারপাশে তার দৃষ্টি ঘুরতে লাগল, টেবিল, ফাইলের স্তূপ, নেগেটিভ···সুমুখের জানালা···ঘন বৃক্ষশ্রেণীর অন্ধকারের জটলা···ঝিঁঝির ঐকতান···কোমরটাকে শ্লথ করে' দিয়ে চেয়ারের গায়ে পিঠ এলিয়ে দিয়ে আরাম করে' বসল সুভদ্রা, পায়ের পর পা তুলে কখনো, দু'একবার হাই তুলল, খুকখুক করে' কাশল কয়েকবার। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে আয়নায় মুখকে একবার দেখে নিল, তারপর কাজের অভাবে গুনগুন করে' গান গাইবার চেষ্টা করল, টেবিলের টাইমপীসটায় রাত্রি সাড়ে নটার সংকেত।

আরো ঘণ্টা দেড়েক বোধহয় অতীত হয়ে গেল, সমস্ত অনুভূতি তখন ধৈর্যের পাথরে ধাক্কা খেয়ে টনটন করছে, মাথার ভেতর দপ্ দপ্ করছে, চোখ দুটো অকারণে জ্বালা করছে এমন সময় একজন ছোকরা এসে ডাকল তাকে।

'আসুন—ডিরেক্টার সাহেব আপনাকে ডাকছেন—'

'এঁ্যা!' ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল সুভদ্রা, বেশ-বাস পরিপাটি করে' গুছিয়ে নিল, উত্তেজনায় হঠাৎ ধক ধক করতে শুরু করেছে হৃদপিণ্ডটা, গলা শুকিয়ে খশখশে লাগছে, রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে সেটের মধ্যে এসে ঢুকল।

'এই যে—' ডিরেক্টার সান্যাল অভ্যর্থনা জানালেন: 'রামানন্দবাবু, কয়েকটি ভঙ্গিতে এর কয়েকটা স্টীল ফোটো নিয়ে নিন তো।'

'আসুন এদিকে এগিয়ে আসুন--' গেঞ্জি গায়ে ট্রাউজার-পরা খর্বাকৃতি হৃষ্টপুষ্ট রামানন্দবাবু। তার হাতের ছোট্ট ক্যামেরা সচল হয়ে উঠল, বার কয়েক ফ্ল্যাস ঝলসে উঠল।

ক্যামেরার মধ্যে সুভদ্রার বিশেষ-বিশেষ ভঙ্গী মুদ্রিত হয়ে রইল।

ডিরেক্টার হেসে বললেন, 'ছবি তোলা হল। দেখি ক্যামেরাতে কেমন আসছ তুমি। আচ্ছা—তুমি আমাব ঘরে গিয়ে বোসো।'

সুভদ্রার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। ঘরে ফিরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। যেন এবার ক্ষীণ আলোর রেশটুকু ধবা যাচ্ছে, ক্যামেবায় তার ভালো ছবি এলে আর কে আটকাচ্ছে তাকে। শরীরের আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে আপন মনে বলে উঠল সে: 'আমি শিল্পী, শিল্পী হতে চাই।'

ডিরেক্টার সান্যাল কিছুক্ষণ পরেই ঘরে এলেন। মুখোমুখী চেয়ারটায় বসে একটা সিগারেট ধরালেন। সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে হেসে জিগ্যেস করলেন, 'চা চলবে?'

সুভদ্রা মৃদু গলায় ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানাল।

'তাহলে কোল্ড ড্রিঙ্ক চলুক। ওহে কে আছ।'

কোল্ড ড্রিঙ্ক এল। ড্রিঙ্কটা সুভদ্রাব দিকে এগিয়ে দিলেন সান্যাল।

সুভদ্রা সলজ্জ হয়ে বললে, 'আপনার—?'

সান্যাল হাসলেন। হাসি দিয়েই যেন অনেক কিছু বোঝাতে চাইলেন তিনি।

গ্লাসে চুমুক দিতে-দিতে মাঝে মাঝে সান্যালের দিকে আড়চোখে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করছিল সুভদ্রা। সারা সন্ধ্যা খাটনির ধকলে কিংবা বাতির আলোকে সান্যালের গৌর মুখটা অস্বাভাবিক লাল দেখাচ্ছে, চোখের দৃষ্টি তন্ময় সুদূর-প্রসারী।

সান্যাল হাতের সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজতে গুঁজতে বললেন, 'কই তোমার বলাই ঘোষ তো এসে পড়ল না।...আর একটু দেখা যাক, নইলে আমার গাড়িতেই তোমায় পৌঁছে দেবো।'

'আপনাব কষ্ট হবে যে—'

'কষ্ট!' হাসলেন সান্যাল: 'আমার কষ্ট দেখতে গেলে তোমার কষ্ট তো কিছু লাঘব হবে না, হবে কি? একটু স্বার্থপর হওয়া ভালো, বুঝলে সুভদ্রা?'

•

ববানগবের গঙ্গার তীব ছাড়িয়ে গাড়ি ছুটে চলল। খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তার পীচ মনে হচ্ছে তেল চকচকে মহিষের পিঠ—পিছলে যাচ্ছে চাকা, পিছলে যাচ্ছে মুহূর্ত, সেকেণ্ড, মিনিট।

সুভদ্রার আজ হঠাৎ মনে হল কলকাতার রাস্তায় জলে ভিজে কী এক ফুলের সুমিষ্ট সৌবভ। সমস্ত ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভরে দিচ্ছে, সারা চেতনাকে প্রখব করে' তুলছে। আঃ! পাশে বসে সান্যাল গাড়ির গতিবেগের দোলায় দু' একটা প্রজাপতি-কথা উড়িয়ে দিচ্ছেন—ডানায় কী আশ্চর্য বর্ণ-বিলাস, কত বিচিত্র রঙের আলিম্পন। ওঁব কথার পেছনে এতদিনকার তমসাবৃত শিল্পলোক লংমায় জ্বলে উঠছে, বর্তমান আর ভবিষ্যতের নাগর-দোলায় দুলছে সমস্ত জীবনটা। শিল্পী, শিল্পীর সাধনা, তার ত্যাগ, অগ্নি পরীক্ষা—শব্দের বর্ণচ্ছটায়, প্রাণময়তায় আপনাকে ভোলে সুভদ্রা। আর মন্ত্রোচ্চারণেব ভঙ্গিতে মনে মনে উচ্চারণ করে পুবানো প্রতিজ্ঞাটা: 'আমি শিল্পী, শিল্পী হতে চাই।' আকাশে বৃষ্টি ধোয়া পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ, কেশজাল সরিয়ে চন্দ্রমা তার মুখচন্দ্র দেখাচ্ছে।

কতক্ষণ অমন অভিভূতের মতো সুভদ্রা বসে থাকত, কে জানে। কপালের পাশে নুয়ে পড়া চুলগুলো নড়ছে, ভীরু সংকোচে আঁখি পল্লব কাঁপছে, রক্তের মধ্যে কেমন এক অবোধ শিহরণ। আর এই মানসিকতাকে যেন স্তব্ধ সমাহিত হয়ে ভোগ করতে ইচ্ছে করছে তার।

গাড়িটা মোড় ঘুরছিল, আর বিপরীত দিক থেকেও বোধ হয় একটা গাড়ি ছুটে আসছিল, ড্রাইভার ব্রেক কসতে সমস্ত ঘুমন্ত চেতনাকে নাড়া

দিয়ে গাড়িটা সর্বশরীরে কেঁপে উঠল। ঝাঁকুনি সামলাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সান্যালের কাঁধে, লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল সুভদ্রা। সোজা হয়ে বসে অপাঙ্গে তাকাল সান্যালের দিকে, সান্যাল নির্বিকার, হাতে সিগারেট প্রচুর ধুমোদ্গারণ করছে, চোখের দৃষ্টি সুদূর পানে। তার গলির মোড়ে গাড়ি এসে থামতে সান্যালের সম্বিত ফিরল। হাসলেন তিনি। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে শিশি বের করে' কী একটা তরল ওষুধ খেলেন। অদ্ভুত উজ্জ্বল আর লাল দেখাচ্ছে ওঁর মুখটা, সুভদ্রার বাহুমূলে আস্তে চাপড় মারলেন একবার, গাড়ি ছেড়ে দিল।

ঘরে এসে অনেকক্ষণ নিথর প্রস্তরের মতো বসে রইল সুভদ্রা। সারা রাস্তায় এতক্ষণ যে ফুলের সৌরভটা লেগেছিল নাকে, হঠাৎ সেই গন্ধটা কেমন বদলে গেছে, কটু-কটু উগ্র বিস্বাদ। জামা কাপড় ছাড়তে গিয়ে কেবল কটু গন্ধটাই ঘুরে ফিরে নাকে এসে লাগছে। একবার মনে হল বোধহয় বলাই ঘোষ ঘরের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে! কিন্তু, না।

বলাই ঘোষ এল কয়েকদিন পরে।

সুভদ্রা খুশিয়াল হরিণীর মতো ছুটে গেল তার কাছে।

'বলাইদা—ও বলাইদা বলো না—আমি পরীক্ষায় পাশ করেছি ?'

বলাই নিরুত্তরে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রচণ্ড জোরে টানতে শুরু করল।

'কিছু বলছ না কেন? ও বলাইদা—কোনো খবর নেই?' সুভদ্রার কণ্ঠে উদ্বেগ ঝরে' পড়ল।

বলাই হাসল। তারপর একটু থেমে বললে, 'হচ্ছে হচ্ছে। এত ব্যস্ত কেন।'

'না না—তুমি বলো—নিশ্চয়ই লুকোচ্ছ আমার কাছে।'

বলাই বললে, 'যখন ছাড়বে না, শোনো—ক্যামেরায় তোমার ছবি ভালো আসেনি।'

'এ্যাঁ!' ধপ্ করে যেন অনেক উঁচু থেকে আছড়ে পড়ল সুভদ্রা। স্পর্ধায় বীর্যে যে শরীরটা আকাশ-প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এক লহমায় তা যেন কুঁকড়ে দুমড়ে এতটুকু হয়ে গেল। কান্নায় দু'চোখ ঢাকল সে। আলো গন্ধে স্পর্শে যে জগতটা তার চোখে অপূর্ব হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ কোন্ দৈত্যের ফুঁয়ে সেই জগতের অস্তিত্ব নিভে গেল, হারিয়ে গেল।

ওর কান্না দেখে নেহাত পাষাণেরই দয়া হত, কিন্তু বলাই ঘোষ বহুক্ষণ নির্বিকার দর্শকের মতো বসে রইল। মেয়েদের চোখের জল তার কাছে কিছু নতুন ব্যাপার নয়।

একটু চুপ থেকে বলাই ঘোষ বললে, 'কেঁদে লাভ কী বলো। ক্যামেরার দোষ নেই, দোষ তাদের যাদেব হাতে ক্যামেরা।···তোমাকে আগেই বলেছিলাম সুভদ্রা : শিল্পী হওয়ার পথ সোজা নয়···'

'না না বলাইদা, যত দামে হোক, যে কোনো দামে হোক, আমাকে শিল্পী হতেই হবে, আমি ফিরতে পারব না।' অশ্রু বিকৃত যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল সুভদ্রা।

চিন্তায় ঘন দেখাচ্ছিল বলাই ঘোষকে। অকাল প্রৌঢ়ত্বের রজত বৈজয়ন্তী উড়ছে তার দেহ দুর্গ ঘিরে। কপালের দুধারে কানের পাশে চুলগুলোয় পাক ধরেছে, চোখের কোলে পাখিব পায়ের মতো আঁকিজুকি। আর গ্রীষ্মের পানা ধরা পুকুরের মতোই তার চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, করুণ। যে উদ্দাম রশি ধরে জীবনের ঘোড়ায় সোয়ার হয়েছিল, সে উদ্দামতা দেহের শেকলে যেন বাঁধা পড়েছে।

'বলাইদা—ও বলাইদা—' সুভদ্রা চিৎকার করে' উঠল : 'বলো আমাকে কী করতে হবে? তুমি ছাড়া যে আমার উপায় নেই।'

বলাই ঘোষ চিন্তার আবর্জনাকে দু'হাতে সরিয়ে দিল মাথা থেকে। বললে, 'ক্যামেবায় ছবি যাতে ভালো আসে তাই করতে হবে।'

'কিন্তু ছবি যদি ভালো না আসে বলাইদা?'

'আসবে আসবে। ক্যামেরা তো মানুষের দাস।'

সুভদ্রার কান্না-ভেজা শরীর, আলু থালু চুল, বিপর্যস্ত বসনে কেমন বিশ্রী দেখাচ্ছিল, দাঁতের চাপে অধোরোষ্ঠ ছিঁড়ে যাবে যেন, লড়াই শ্রান্ত বেড়ালের মতো চকচক করছে ওব চোখেব তারা।

বলাই ঘোষ উঠতে উঠতে বললে, 'তাহলে তৈরি থেকো। রাত্রে রামানন্দবাবু আসবেন।'

কোনোমতে মাথা নেড়ে সুভদ্রা বললে, 'আচ্ছা।'

বেরিয়ে গেল বলাই ঘোষ।

হাসতে-হাসতে পেটে খিল ধরে যায় পটলের। বড়বাজারে কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছিল সন্ধ্যায়। আর সেখানেই বহুদিন পরে দেখা চিৎলাঙ্গিয়ার সংগে। কোন্ চিৎলাঙ্গিয়া? সেই যে গো দিলসুখ চিৎলাঙ্গিয়া —বড়বাজারে কাপড়ের গদি। ভুলে গেলে এরই মধ্যে!

চিৎলাঙ্গিয়ার সংগে একযুগ আগেব পরিচয়। মাঝে সূত্র হারিয়ে গিয়েছিল বছর তিনেক, চিৎলাঙ্গিয়া বাজপুতানায় যাবার পব। আলাপ হয়েছিল অদ্ভুত ভাবে। থিয়েটারের নেশা ছিল পটলের। সেজেগুজে মুখে পান ফি-রবিবারে স্টাবে নিযমিত হাজিরা ছিল পটলের। আর এমনি এক থিয়েটার দেখতে দেখতে দেবলাদেবীর দৃশ্যের মাঝখানে পাশেবসা চিৎলাঙ্গিয়াব বর্বর হাতের ইঙ্গিতকে আমোদের সংগেই স্বীকাব কবে' নিল সে। গুণে গুণে পা ফেলে-ফেলে এগোল পটল, আর প্রতিটি পদক্ষেপ চাঁদিব টাকা দিয়ে যাচাই কবে' নিল। ভাড়া ট্যাক্সিতে কোনোদিন হিন্দুস্থান, কোনোদিন বেঙ্গল বেস্ট্রেণ্ট, কোয়ালিটি আব বাওয়াব হোটেলের ক্যাবিনে। মাঝে মাঝে পায়ের ধুলো পড়েছে চিৎলাঙ্গিয়ার তাব ঘরেও। মদ খেত না দিলসুখ, মদের দাম আদায় কবত পটল। এক কথায়: কয়েকটি বছর সে ছিল পাটবাণীব সম্মানে।

সেই দিলসুখ চিৎলাঙ্গিয়া আবাব ফিরে এসেছে। আর কী ভাগ্য, দেখা হয়ে গেল তার সংগে।

হাসিতে ফুলতে-ফুলতে পটল বললে, 'জানিস ছবি, আমায় বলে কি— সেণ্ট্রাল এভিন্যুতে ফ্ল্যাট ভাড়া নিচ্ছি তুমি সেখানে থাকবে।'

ছবি বললে, 'তুই কি জবাব দিলি?'

পটল বললে, 'অমনি জবাব দিয়ে দিলেই হল। অত সস্তা। একটু খেলাতে হবে না।'

'খেলাতে গিয়ে হাত ছাড়া না হয়ে যায়, দেখিস।'

'আমার নাম পটল, আমি পটল তুলিয়ে ছাড়ব না!' হাসির হর্‌রা ছুটল।

'তুই তাহলে সত্যিই যাবি?' ছবিব গলায় কুতূহল।

পটল হেসে বললে, 'এমন কাতরভাবে জিগ্যেস করছিস যে মনে হচ্ছে আমি না গেলে তুইই চলে যাস।'

ছবি ঠোঁট উলটে বললে, 'বয়ে গেছে আমার যেতে। আমাকে তো আর বে' করবে না দিলসুখ। কারুর ইয়ে হতে ব'য়ে গেছে আমার।'

'তোর যে ভাই জোর মুরুব্বি আছে—ফলি মিস্ত্রি। আমাদের চিৎলাঙ্গিয়া সম্বল। যদি যাই, কেন যাব জানিস? দিলসুখের জন্যে নয়, ওর উঠতি-ছোকরা ছেলে প্রেমের জন্যে। যতক্ষণ ওর দোকানে ছিলাম, আমার লক্ষ্য ছিল প্রেমের দিকে। দেখলাম জহুরি জহর চেনে। টোপ গিলবে নির্ঘাত।'

'ও ছুঁড়ি তোর পেটে পেটে এত!' ছবি অবাকের ভঙ্গী করে' বললে।

পটল হেসে বললে, 'পেটের জন্যেই তো এত। আর পেটে মিললেই পিঠে নেয়া যায়, কী বলিস?'

'কিন্তু···দিলসুখ জানতে পারলে? বাপের এঁটো পাতে ছেলে মুখ দেবে। তারপর?'

'তারপর আর কী, দুই রাজপুতবীর যুধ্যু করবে, আর আমি হিন্দি ছবির রাণীর মতো মাঝখানে বসে থাকব।'

হাসিতে ফেটে পড়ল দুজনে।

হাসি থামিয়ে গম্ভীর মুখ করে' পটল আবার বললে, 'বুড়ো ভগবানটাকে পেলে এখুনি ওর তোবড়া গালে একটা চুমু খেতাম। ভেবে ভ্যাখ: কী রঙ-রস দিয়ে আমাদের দেহটাকে ও বতন করে' গড়ে তুলেছে, আর লেলিয়ে দিয়েছে গোটা মরদ জাতটাকে আমাদের দিকে। মেয়েলী ছাঁদের দেহটা যদি না থাকত তাহলে আমাদের কী দশদশা হত!'

'কী কথা হচ্ছে রে তোদের?' বিন্দু এসে দাঁড়াল।

'এই এক ছুঁড়ি—' বিন্দুকে লক্ষ্য করে' পটল মন্তব্য করল: 'ওর চোখের জল আর কোনোদিন শুকোবে না। ঘরে বসে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ও লংকা জয় করবে। গেঁইয়া আর বলেছে কাকে!'

বিন্দু রাগল না, ম্লান হাসল। বললে, 'কেউ কেঁদে ধরা পড়ে, কেউ কেঁদেও ধরা পড়ে না। কাল সারা রাত্তির কে কেঁদেছিল তোমার ঘর থেকে, পেত্নী নয় নিশ্চয়।'

'কে? কে বললে তোকে?' নিজেকে ঢাকতে গিয়ে আরো বেআব্রু হয়ে পড়ে পটল: 'সব মিছে কথা। বেজায় দাঁত ব্যথা করছিল তাই··· তোর মতো মিথ্যুক—ভাগ, ভাগ এখান থেকে—'

পটল বিন্দুকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছুটে পালাল। কিন্তু পালাতে পারল কি নিজের কাছ থেকে। ঘরে এসে হাঁফাতে লাগল, চোখ মুখ লাল হয়ে

উঠল, এক সময় ধপ্ করে মেঝের ওপর বসে পড়ল। না কাঁদবে না, কিছুতেই না। কিসের ভয় পটলের? তার দিলসুখ আছে, তার প্রেম আছে।

কিন্তু…তবু কী কান্না মানে। ডুবন্ত লোকের সামনে যেমন সমস্ত অতীতটা মালা-গাঁথা হারের মতো দুলে-দুলে ওঠে তেমনি চোখের জলের আবছা দৃষ্টিতে ফেলে-আসা দিনগুলির ছেঁড়া ছেঁড়া ঘটনা স্পষ্ট মনে পড়তে লাগল। জয়নগর-মজিলপুরের কৈশোর আর যৌবনের খাঁচায় ফ্যাকাশে হয়ে আসা দিনগুলি নার্শিং-এর সাদা পোশাকের মতোই বর্ণহীন। আর শহরের পথে পথে মনের মতো বর-খোঁজার অধ্যায়গুলি। হায় রে!

ছবি জিগ্যেস করল: 'তোর বরের কোনো খবর পেলি?'

বিন্দু ফিশফিশ করে' বললে, 'পেয়েছি। দশ বছর জেল হয়েছে।'

'দশ বছব!' ছবি ব্যথা-ভরা কণ্ঠে বললে, 'যাক। ফাঁসীব হুকুম হয়নি তাহলে। কী করবি বল্, সবই ভাগ্য। ভাগ্য তোকে সোয়ামী মিলিয়ে দিয়েছে, অদেষ্ট, ভোগান্তি তোর পোড়া কপালে।'

বিন্দু মোহাবিষ্টের মতো বিড় বিড় করে' উঠল: 'নাবকেল গাছেব মাথা কাঁপতে দেখলেই আমার গা শিরশির লাগে। আচ্ছা, আমরা তো নারকেল গাছ কাটিনি, তবে আমাদের এ-কষ্ট কেন?'

ছবি ধমক দিয়ে উঠল: 'কী বাজে বকছিস। তোব মাথা খাবাপ হবে দেখছি। মেনে নে, যা আসছে' যা হচ্ছে—কপাল চাপড়ালে কী হবে।'

'মানতে তো চাই। কিন্তু পোড়া চোখের জল থামে কই।'

অন্যদিনের রাত্রির মতো আজকের রাত্রিটাও আসছিল ক্লান্ত একঘেয়েমির পায়ে-পায়ে। নিদ্ আসছিল চোখের পাতায়, সারাদিনেব কাজের ভীড়ে অবসন্ন মস্তিষ্কের বাঁধন শ্লথ হয়ে এসেছিল। আর একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ত মেনকা।

ছবির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল।

'এত রাত্রে জ্বালাতে এলি তো?' মেনকা বিরক্ত গলায় ঝংকার দিয়ে উঠল।

'শীগ্গির—শীগ্গির—উঠে আয় না—'

'তোর সেই এক চিন্তা। সুভদ্রার ঘরে লোক এসেছে—এই তো? দরজা খুলে রাখ তোর ঘরেও কোনো মদ-মাতাল এসে যেতে পারে। যা শোগে—'

'নাগো, না। একেবারে নতুন লোক, আনকোরা। বরানগরের স্টুডিয়োতে যেন দেখেছি। চল দেখিনা, সতীলক্ষ্মী কেমন শিল্পী হওয়ার পাঠ নিচ্ছে। দ্বিতীয় পাঠ!' হি-হি করে' হেসে উঠল ছবি।

'যা বিরক্ত করিসনে, ঘুমোতে দে—' পাশ ফিরে শুল মেনকা।

মেনকাকে তুলতে না পেরে একাই চলে গেল ছবি। মেনকা জানে ও আড়ি পাতবে, ফুটো দিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি মারবার চেষ্টা করবে, আর হিংসা আর জ্বালায় ছটফট করবে গরমে গা-ভরতি ঘামাচি হওয়ার মতো। চুলকে আঁচড়ে যতক্ষণ না ঘামাচিগুলো গালিয়ে দিতে পারবে ততক্ষণ অন্ধকারে সুভদ্রার দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকবে সে। তারপর —বহুক্ষণ পরে ঘুমের বন্যায় চোখদুটো আপ্লুত হয়ে এলে পরে টলতে টলতে ছুটে যাবে ঘরে, টলমল শরীরটাকে ছুঁড়ে দেবে বিছানার' পরে।

কিন্তু···কে চিৎকার করছে তারস্বরে? ঘুম ভেঙে গেল মেনকার। কে? বিন্দুর গলা না! তাড়াতাড়ি শাড়িটা জড়িয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এল মেনকা। বিন্দুব ঘর ভেতর থেকে বন্ধ।

'বিন্দু—এই বিন্দু—'

বিন্দু তারস্বরে চিৎকার করছে। নাকি গান গাইছে, না, গান নয় তো, কাঁদছে। না: কান্নাও তো নয়! তবে? গান নয়, কান্না নয়, কেমন এক অব্যক্ত চিৎকার।

'বিন্দু—ও বিন্দু—দরজা খোল—'

বিন্দুর কণ্ঠস্বর আরো উচ্চরোলে উঠল।

'বিন্দু—অ বিন্দু—কী হয়েছে তোর? দরজা খোল। আমি—আমি মেনকা···'

মেনকার গলার আওয়াজে আর বিন্দুর চিৎকারে নিস্তব্ধ রাত্রির আবহাওয়া সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এঘর ওঘর থেকে ছুটে এল সকলে। একযোগে সকলে ডাকতে লাগল। দোরে করাঘাত শুরু হল। বিন্দুর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, বিকার নেই। প্রায় আধঘণ্টা পরে সকলে ক্লান্ত হয়ে যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে, দরজা খুলল বিন্দু। হুড়মুড় করে' ঢুকে পড়ল ওরা।

আলুথালু বেশবাস, চোখ বেয়ে কালো চুলের রাশ, ইঁদুরের মতো পিট পিট করে' জ্বলছে বিন্দুর চোখ।

'কী হয়েছে, কী হয়েছে তোর, এই বিন্দু—'

তীরবেঁধা শাবকের মতো মেনকার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিন্দু, মাথা ঝাঁকিয়ে যন্ত্রণায় ক্লিষ্টস্বরে বলে' উঠল: 'পারলাম না, পারলাম না ভাই, বুক পুড়ে যাচ্ছে, বড্ড যন্ত্রণা · '

তবে কি বিষ খেয়েছে পোড়ামুখী মেয়েটা! না বিষ নয়। মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে দেশী মদের একটা বোতল। একটি পুরো বোতলই গলায় ঢেলে দিয়েছে বিন্দু।

'তুই মদ খেয়েছিস। ছি-ছি-ছি!'

'কিন্তু ভাই, বুকের জ্বলুনি কমে কই, ভুলতে পারি কই! আমি কী করব—মানুষটার দ-—শ বছর জেল হয়ে গেল · ' ভেউ ভেউ করে' কেঁদে উঠল বিন্দু।

জোর করে' ওকে বিছানায় শুইয়ে দিল মেনকা। বাটিতে করে' তেঁতুলগোলা নিয়ে এল পটল। গভীর ঘুমে অচেতন হবার আগে সারা বিছানায় আর মেঝেয় বমি করে' ভাসিয়ে দিল বিন্দু।

অশুভ সংবাদের ডানা আছে, তাই উড়তে পারে। কিন্তু শুভ খবর হাওয়ায় ওড়ে না, ওজনে ভারি বলে' তা গভীর হয়ে এক জায়গায় গেঁথে থাকে।

সেদিন সুটিং-এর শেষে পরিচালক বসু ডেকে পাঠালেন বিন্দুকে। আর এইভাবে বিশেষ করে' একজনকে ডেকে পাঠানোর মধ্যে যে সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে থাকে, তা' আর মেয়েদের নতুন করে' বলতে হবে না। পটল আর ছবি অনেকক্ষণ বসে জল্পনা করল, এবং যতই কল্পনা করতে চেষ্টা করল ততই যেন সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেল। আর অন্ধ একটা বেদনা, নাকি ঈর্ষা, ফোঁড়ার মতো টনটন করতে লাগল বুকের মধ্যে।

স্টুডিয়োতে কাজের ভিড়ে আর কোনো কথা হল না।

বাড়িতে ফিরতেই বিন্দুকে আঁকড়ে ধরল ওরা।

'কীরে? কীরে বিন্দু?' ওদের জিজ্ঞাসার পেছনে একটা পাতলা আবেগ থর থর করে' কাঁপছিল।

বিন্দু সরল মনে বললে, 'কিছু বুঝতে পারলাম না ভাই। বোস সাহেব অনেকক্ষণ আমার মুখটা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন, হাসতে বললেন, কাঁদতে বললেন একবার। তারপর—তারপর বললেন, তোমাকে দিয়ে একবার দেখতে চাই···' বলে' চুপ করল বিন্দু।

ছবি কুতূহলে পুড়তে-পুড়তে বললে, 'ব্যস হয়ে গেল আর কিছু না? কেন লুকোচ্ছিস ভাই?'

'বারে! লুকোব কেন!' বিন্দু হেসে বললে, 'তারপর বোস সাহেব বললেন, তোমাকে দিয়ে একবার দেখতে চাই। কুন্দ-র পার্ট তোমার দ্বারা হয় কিনা!··· আচ্ছা পটল, কুন্দ কে ভাই?'

পটল মুখ গোঁজ করে' বললে, 'হবে কেউ। সখী কিংবা হিরোনের দাসি-বাঁদি··'

'না তা নয়—' মেনকা বললে, 'কুন্দ হচ্ছে কুন্দনন্দিনী' 'বিষবৃক্ষ' পড়িসনি?'

'বিষবৃক্ষ আবার পড়তে হবে কেন? আমরা নিজেরাই তো এক-একজন বিষের ঝাড়।' ছবি বললে।

মেনকা বললে, 'দূর বোকা! তুই কিছ্‌ছু জানিস নে। বংকিম চাটুয্যের নাম শুনিসনি?'

ছবি এমনভাবে ঠোঁট বেঁকালো যেন বোঝাতে চাইল: বংকিম চাটুয্যের নাম না-শোনা থাকলে তার কোনো ক্ষতি নেই।

বিন্দু জিগ্যেস করল: 'হ্যাঁ ভাই মেনকা, কুন্দ কি ধরণের পার্ট?'

মেনকা বললে, 'বিষবৃক্ষে দুজন নায়িকা—সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী।'

ছবি বললে, 'বাবা! নায়িকার পার্ট! তাহলে তো মস্ত বড় পার্ট! বিন্দুকে দেবে নায়িকার পার্টে? সত্যি, সত্যিরে বিন্দু?' শেষের স্বরটুকু এমনভাবে বেজে উঠল যেন কান্নার নদী পার-হয়ে-আসা। বিশ্বাস আর অবিশ্বাস। বেদনা আর ঈর্ষা।

পটল বললে, 'কি করে' জমালি ভাই বোস সাহেবকে? তোর ওই গেঁইয়া মুখ দেখেই ভুলে গেল! বলে: এ্যাঙ্গ গেল চ্যাঙ্গ গেল, ব্যাঙ হল রাজা; নাকি রে ছবি?'

মেনকা হেসে বললে, 'গেঁইয়া মেয়েই তো খুঁজছিলেন বোস সাহেব।

আর গাঁয়ের সমস্ত রঙ যেন বিন্দুর মুখে ফুটে রয়েছে। চমৎকার মানাবে কিন্তু।'

'ছাই ছাই ছাই। ছবি লালবাতি জ্বালবে।' রোষভরে পটল ছবি দুজনেই চলে গেল।

বিন্দু গালে হাত দিয়ে বসেছিল। সামনে সজনে গাছের মাথার ওপর বোধহয় শুকতারাটা জ্বলছিল। আকাশে পেঁজা তুলোর মতো ছাড়া ছাড়া মেঘ। চাঁদ আজ বিলম্ব করে' উঠবে।

'কী ভাবছিস এই বিন্দু?'

'এ্যাঁ। না ভাই, কিছু না—'

না। আজ আর কিছুই ভাবছে না বিন্দু। নারকেল গাছের পাতাগুলো আজ তেমন করে' কাঁপছে না, চাঁদের ছায়াও পড়েনি কালো দীঘির জলে, কালো পোড়া তেলের মতো তরঙ্গহীন নিষ্কম্প জল। গন্ধ আসছে নাকে। পচা, বিদঘুটে। সেদিন মদ খেয়ে সকালে উঠে যেমন একটা বাসি গন্ধ লেগে ছিল নাকে। শুধু মদের গেঁজে-ওঠা গন্ধ নয়, তাকে ছাড়িয়েও কেমন কালো-হয়ে আসা রক্তের আঘ্রাণ ভেসে আসছে। রক্ত, রক্ত, রক্ত। দ—শ বছর। দশ বছর গাবদ হয়ে গেল মানুষটার। না, না—বিন্দু নয়, কুন্দ, সে কুন্দ-ফুল।

'বিন্দু—এই—কী ভাবছিস?'

বিন্দু হাসল। বিশীর্ণ, পরিশ্রান্ত।

'মেনকা, আমি নায়িকে হতে চাইনে। চাইনে কুন্দ হ'তে। আমি বিন্দু, বিন্দু হয়ে ফিরে যেতে চাই…'

মেনকা সস্নেহে ওর রুক্ষ মাথায় হাত বুলোতে লাগল। 'তুই একেবারে পাগল, আর ভীষণ ছেলেমানুষ…'

সারারাত্রি হামজ্বরের মতো ছটফট করল বিন্দু। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে ঘুমে, ঘুম আসছে না। ক্লান্তি নয়, বেদনা নয়, কেমন এক ভোঁতা শূন্যতা পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে সমস্ত অনুভূতিতে। আর নাসারন্ধ্র ভরে কেবল এক বিশ্রী বিদঘুটে গন্ধ…ঝিমঝিম করে উঠছে সারা শরীর। একটা বোতল আনিয়ে খাবে নাকি সে। না। তাতে তো বোটকা গন্ধটা দূর হবে না। তার চেয়ে—আর কিছু ভাবতে পারে না বিন্দু।

সে কুন্দ, কুন্দ-ফুল। ঘর-বাহির সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, যে ঘরের রোদ-বিছানো আঙ্গিনায় তার ইচ্ছাগুলোকে সে মেলে দিয়েছিল, হঠাৎ হাওয়া লেগে সে ইচ্ছাগুলো যেন উড়তে শুরু করেছে, তার মনটা না পারছে ঘরকে বরণ করতে, না বাহিরকে। বিন্দু…কুন্দ…কুন্দ…বিন্দু।

নিস্তরঙ্গ জীবন-স্রোত বয়ে চলল। বিন্দুর ঘুমহারা চোখের প্রদাহে, পটলের চিৎলাঙ্গিয়া আসঙ্গলিপ্সায়, ছবির ফলি মিস্ত্রির যুগ্ম স্বপ্ন-সম্ভাবনায়, সুভদ্রার উত্তেজনা-কম্পিত প্রতিদিনের বেদনায় দিন এগিয়ে চলল। আর মূক দর্শকের মতো যেন এসব ঘটনার নির্জন সাক্ষী হয়ে রইল মেনকা।

রুখে দাঁড়াল মেনকা।

অন্নদা মালি বিড়িতে সুখটান দিয়ে বললে, 'আপত্তি করলে চলবে কেন? এই ছাখ—তোমাদের পোশাকের ফিরিস্তি…'

'না। কিছুতেই না। আমাদের ইজ্জত আছে, আব্রু বলে' একটা জিনিস আছে। এই ভাবে অসভ্যের মতো পোশাক পরতে পারব না।'

অন্নদা ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'তাহলে বোস সাহেবকে বলি গিয়ে। আমি তো হুকুমের চাকর মাত্র। ফর্দ মিলিয়ে পোশাক এগিয়ে দিয়েই খালাস।'

উত্তেজনায় রাগে লজ্জায় কর্ণমূল লাল হয়ে উঠেছিল মেনকার। সমস্ত বুকের ভেতরটা যেন দাউদাউ করে জ্বলছিল তার।

পটল ফিসফিস করে বললে, 'কাজটা কি ভালো করলি?'

মেনকা কঠিন গলায় বললে, 'জানি না।'

অন্নদা মালি পরিচালকের কাছে যাবার আগে বাইরে এসে কিছুক্ষণ চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের একটা দুঃখবোধের জায়গায় কোথায় যেন এক দরদ আর সমবেদনা মাখানো ছিল এই মেয়েগুলির জন্যে। সত্যি বলতে কি, এই ধরণের পোশাক এগিয়ে দিতে তারই কেমন লজ্জা করছিল। কিন্তু…আবার একটা বিড়ি ধরাল সে। কর্তব্য! কথাটা যেন নিজের কানেই কেমন ঠাট্টার মতো শোনাল।

পরিচালকের ঘরেই এগিয়ে যেতে হল।

'স্যার—'

'কী হয়েছে?' নিবিষ্ট মনে স্ক্রীপ্‌ট পড়ছিলেন মিঃ বোস, বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঁচকালেন।

'স্যার—মেয়েরা পোশাক পরতে চাচ্ছে না।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন্‌—' পরিচালক গর্জে উঠলেন: 'আমি গিয়ে পোশাক পরিয়ে আসব? হোয়াট্‌ এ জোক!'

'আমি তা বলছিনে স্যার—'

'তবে? হোয়াট হেল্‌ ডু ইউ আর হীয়ার ফর্‌?'

'ওধরনের পোশাক পরতে ওরা আপত্তি করছে স্যার—'

'আই সী।'

গোলমাল শুনে হিরোইনের কামরা থেকে সুনেত্রা দেবী বেরিয়ে এলেন।

'কী হয়েছে মিঃ বোস?'

'এই যে—দেখুন দিকি—মেয়েরা কিছুতেই পোশাক পরতে চাইছে না—'

'কেন? কি হয়েছে?'

অন্নদা বললে, 'মানে—ওধরনের ইয়ে পোশাক পরতে চাইছে না।'

'প্লীজ, একটু দেখুন না সুনেত্রা দেবী, যদি বোঝাতে পারেন ওদের …'

'আচ্ছা দেখছি—'

অন্নদা মালির সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন সুনেত্রা দেবী।

'কী হয়েছে, ব্যাপার কী তোমাদের? পোশাক পরছ না কেন?' মেনকার দিকে দৃষ্টি হানলেন সুনেত্রা।

'আপনিই বলুন দেখি, এ ধরনের জঘন্য পোশাক মেয়েরা পরতে পারে? এই যে দেখুন, দেখুন …' অশ্লীল পোশাকগুলি তুলে দেখাতে লাগল পটল।

সুনেত্রাকে চিন্তিত দেখাল। পরক্ষণে চিন্তার মেঘ সরিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'ছবিতে নামতে এসে এত বাছবিচার চলে না। ডিরেক্টার যা নির্দেশ দেবেন তাই পরতে হবে। কেন? আমরা ভদ্রঘরের মেয়েরা পরছি নে?'

মেনকা আহত হয়ে বললে, 'আপনি মেয়ে হয়ে একথা বলছেন? আপনি—আপনি…' ক্ষুব্ধ রাগে তোতলাতে লাগল মেনকা। 'ডিরেক্টার যদি উলঙ্গ হয়ে নাচতে বলে, তাই নাচব আমরা?'

'যদি দরকার হয় নাচবে বৈকি। অভিনয় হচ্ছে আর্ট, আর্টকে সেবা

করতে হলে লজ্জা করলে চলবে না। নাও, পোশাক পরে' নাও তোমরা।'
দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন সুনেত্রা।

একরাশ পোশাকের তলায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে ছিল মেনকা। ওর মুখের দিকে কেউ যদি তখন তাকিয়ে দেখত তাহলে মনে হত কে যেন তার গালে চড় বসিয়ে দিয়ে গেছে। কতক্ষণ ওইভাবে বসে থাকত, কে জানে। বিন্দু ওকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'কী করবি ভাই, ভদ্দর ঘরের মেয়েরাই এই ধরনের পোশাক পরছে, আমরা তো…'

মেনকা কোনো উত্তর দিল না। পাথরের মতো স্থির বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর উঠে পোশাকগুলো পরে' ফেলল। আজ অত্যন্ত বেদনার সংগে মনে পড়ছিল কেবল বাড়ির কথা। তার ভাগ্যের কথা। এইতো সেদিনও জামাইবাবু এসেছিল, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিল। যত খারাপ হোক, ভগিনীপতি তো! সুখ না-থাক স্বস্তি ছিল। লজ্জাও ছিল হয়তো, কিন্তু সে-লজ্জা এমন দশজনের সামনে দাঁত বার করে' হাসত না। তার মনে হচ্ছে—আবার যদি জামাইবাবু আজ-বা-কাল তার কাছে আসত, তাহলে এবার নিশ্চয়ই সে চলে যেত, মনে মনে ওর আগমনকে আশীর্বাদ বলেই মনে করত সে।

স্টুডিয়োর সারা আকাশে তখন রহস্যময় রাত্রি নেমে এসেছে। আর উতরোল হওয়ার দম্ভিপনা। আকাশে অজস্র নক্ষত্রের কৌতুক।

ওদের শুটিং শুরু হতে বেশ দেরি হবে। ঘরের মধ্যে ধূলিমলিন সতরঞ্চের উপরেই কেউ গা এলিয়ে দিয়ে শুয়েছে, কেউ জানালার ফাঁক দিয়ে রাত্রির ইঙ্গিতকে বোঝবার চেষ্টা করছে। সমস্ত আবহাওয়া থমথমে, বিষণ্ণ। ভাবনার সুতো খোলবার সময়ও বোধ হয় এই।

গুটিগুটি বেরিয়ে পড়ল ছবি। সেই পাঁচিলের আড়ালে যেখানে শিশু-কৃষ্ণচূড়া গাছটা স্বপ্নের আল্‌পনা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তার নিচে শ্যাম-দূর্বাদল, খালি পায়ে হাঁটতে বুকের রক্ত নিষিদ্ধ আবেগে আছড়াতে থাকে, বাঁকা কাস্তের মতো ইদের চাঁদ ঝুলে থাকে গাছের মাথায়, আর, আর…

সবল এক জোড়া বাহুপাশ, পরিচয়ে নিবিড়, গভীর, যেখানে অজস্র সুখ আর প্রশান্তি। হাসি, আনন্দ, গান, রঙ। মাথা ভরতি কালো কুঞ্চিত ভ্রমর-কেশ, আঙুল দিয়ে বিলি কাটো, উন্নত নাসিকা, প্রশস্ত কপাল,

আর তার নিচে ভারি চোখের পল্লব, হাসলে চোখ বুঁজে যায়, খোলা-চোখ কেবল কটাক্ষ হানছে। আর পুরু রসালো ঠোঁটে যেন কচি আমের আঘ্রাণ।

'ফলি, ফলি আমার ফলি···' গুনগুন করে' উঠল ছবির সমস্ত সত্তা। ফলির সমস্ত দেহ, দুই করতল, তার চোখ যেন কথা কইতে পারে, ছবির দেহ ঘিরে যেন কি-এক মন্ত্রোচ্চারণ করে সে, সে মন্ত্রে ঘুমন্ত রাজকন্যারা সোনার কাঠির স্পর্শে জাগে, কাঁদে, হাসে, অজস্র সুখে পাকা দাড়িম্বের মতো ফেটে পড়ে। 'আস্তে আস্তে লক্ষ্মীটি···' ছবি চাপাস্বরে অনুযোগ তুলল: 'আমার পোশাক নষ্ট করে' দিও না, সেটে দাঁড়াব কি করে?' তবু কি ডাকাতটা কথা কইতে দেবে, শুনবে কি কোনো বারণ, অত যদি শখ হয় আর দেরি করছে কেন, বিয়ে-শাদি করে' ফেলুক না। ছবি তো তৈরি, দেহ-মনের বাতি জ্বেলে সে যে প্রস্তুত হয়ে আছে। 'যাবে, আজ যাবে?' 'না।' 'ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোঁসাই।' 'একটু দেরি করো, গুছিয়ে নিতে দাও।' 'গুছিয়ে নিয়েই এসো, আগাম কিছু চেয়ো না। যা তোমার, কেবল তোমার, সেখানে জবরদস্তি কোরো না।'

কৃষ্ণচূড়া প্রবল বাতাসে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। রাত্রির ঘুমন্ত চোখে আকাশের তারাগুলি কাঁপছে। চাঁদের বুড়ি ডাইনি তেমনি সুতো কেটে চলেছে।

ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ল ছবি। 'যাই, বোধ হয় ডাক পড়েছে—' দ্রুত হরিণীর মতো ছুটে পালাল সে।

স্টুডিয়ো থেকে ফিরতি গাড়িটা মেয়েদের নিয়ে ছুটে চলেছিল, চৌরঙ্গীর মোড়ে আটকে পড়তেই বিপরীত দিক থেকে আর একটা মোটরকার ব্রেক কষে দাঁড়াল। গাড়িটা ছেড়ে দেবার পরেই ছবি চিৎকার করে' উঠল: 'সুভদ্রা, সুভদ্রা ওই গাড়িতে। পাশে ও বাবুটি কে?' ছবির চিৎকারে অন্য মেয়েরা মুখ বার করে গাড়িটাকে দেখবার চেষ্টা করল, কিন্তু উর্ধ্বশ্বাসে গাড়িটা তখন উধাও হয়ে গেছে।

গাড়ি ছুটছে। ড্রাইভারের সীটে সাহিত্যিক-পরিচালক সান্যাল, পাশে সুভদ্রা। সান্যালের মুখে জ্বলন্ত সিগারেট, খদ্যোতের আলোকের মতো

একবার জ্বলছে, নিভছে। সান্যালের চোখে সুদূরের মায়া, দূরের দিগন্তে যে বিষণ্ণ-বৈরাগ্য তারই আলোকে সারা মুখটা অপার্থিব হয়ে উঠেছে। রাত্রির তীক্ষ্ণ হাওয়ায় তাঁর অসজ্জিত চুলগুলো নিরস্ত্র সৈনিকের মতো উদ্‌ভ্রান্ত।

যতবার পাশের মানুষটির দিকে তাকায় ততই বিস্ময়ে হৃদয় শতধা হয়ে ফেটে পড়ে সুভদ্রার। আর প্রতিবারই যেন ওই ধ্যানী পুরুষটিকে সে নতুন করে' আবিষ্কার করে। জীবনে পৌরুষ কাকে বলে জানেনি সে, দেখেনি সেই পুরুষকে যিনি শত উপলখণ্ডের ঠেলাতেও ভারি প্রস্তরের মতো স্থির, অকম্প। জীবনে সেই পুরুষের দেখা কজনের পাওয়া যায়! তার বাবাকে দেখেছে, মামাকে দেখেছে, দেখেছে বলাই ঘোষকে, রামানন্দ বাবুকে। কিন্তু নিজের গণ্ডীতে-বাঁধা জীবন তাঁদের কত তুচ্ছ, কত অসহায়, আর করুণ। ওঁদের থেকে কত আলাদা পরিমলবাবু। ব্যক্তিত্বের জ্যোতির্ময় সূর্যালোকে তাঁর চরিত্র বনস্পতির মতো সতেজ।

ভেতর থেকে চোখ ফিরিয়ে চলমান কলকাতার দিকে চোখ রাখল সুভদ্রা। কলকাতা কতবার দেখেছে বলাইদার সংগে, কিন্তু এ-কলকাতার স্বাদ যেন আলাদা, শরীরে জড়িয়ে ধরা সিল্কের শাড়ির মতো সুন্দর কলকাতা যেন চোখের পেলব দৃষ্টির সামনে পিছলে যাচ্ছে। আঙুলের ফাঁকে গলে-পড়া জলের মতোই এ-কলকাতা অ-ধরা অথচ স্পর্শগ্রাহ্য। এই জীবনই তো চেয়েছিল সুভদ্রা, এমনি কোমল, নমনীয়—ভালো-লাগা আর ছোঁয়ার সুখময় অনুভূতি। আর পাশে-বসা মানুষটি যেন স্বপ্নলোকের চাবি যার আঙুলের চাপে একটি একটি করে' রহস্যের দরজা খুলে যাচ্ছে, দরজা টান-টান করে' মেলে দিয়ে বলছে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ: 'দেখো-দেখো, জীবনের শিল্প-রূপ, জীবনই শিল্প, শিল্পই জীবন। জীবন পৌঁছেছে শিল্পের শেষতম চূড়ায়, যেখানে শিল্প আর জীবন যুগল লীলায় সুঠাম…' কথা, কথা আর কথা। হাওয়ায় বলাকা উদ্দাম পাখা মেলেছে, বায়ুতরঙ্গ চঞ্চল, সেই ছন্দে জীবন ভাসছে স্রোতে দোলা-লাগা পদ্মের মতো,নব নব…

আনন্দে রোমাঞ্চে চোখ বন্ধ করে' ফেলল ভয়ে। আনন্দ যজ্ঞের পুণ্যে সমস্ত অন্তরাত্মা ধূপের মতো জ্বলছে। আনন্দের তরঙ্গে আনন্দকে নেচে উঠতে হবে। সমস্ত দেহ যেন শরতের মেঘের মতো হালকা হয়ে আসে, হাতের কঠিন মুদ্রাগুলি অনায়াস হয়ে ওঠে, হৃদপিণ্ডে বাজছে ত্রিমি-ত্রিমি পাখোয়াজের সুর, আনন্দের লক্ষ লক্ষ ফণা যেন জড়িয়ে ধরছে নরম কবরী

শিথিল কঠিন বাহুপাশ যেন আনন্দের-পিপাসায় বন্ধন-উন্মুখ···আঃ! যখন চোখ খুলল সুভদ্রা গাড়ি থেমে পড়েছে রেড রোডের নিরালা কোণ ঘেঁসে, আলো-আঁধারিব আলিঙ্গন চলেছে স্থানটিতে, আনন্দের মিষ্টি রেশগুলো যেন এখনো লেগে রয়েছে সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে, দারুণ গ্রীষ্মে সর্বশরীর ঘামে নাইছে তার, আর কপালের দুপাশেব শিরা দুটো এতক্ষণকার উত্তেজনায় দাপাদাপি করছে। পাশ ফিরে তাকাল সে। সান্যাল তখনো ধ্যানী বুদ্ধের মতো স্থির, হাতেব ফাঁকে সিগারেট জ্বলছে, সমগ্র জীবন-এষণা যেন তার চোখ দুটোয় এসে ভর করেছে, চক চক করছে চোখ···

'চলো, এবার ফেরা যাক—' পকেট থেকে শিশি বা'র করে' ঢক ঢক করে' কি-একটা ওষুধ খেলেন সান্যাল। তারপর গাড়ি ছুটল। নগরীব কোলাহল কমে এসেছে, দু' একটা হোটেলে আলো জ্বলছে, বিজ্ঞাপনের আলোগুলো জ্বলছে, নিভছে। একটা ট্রাম ছুটে গেল ধাতব আর্তনাদে, স্টেট-বাসটা শেষযাত্রী নেবার জন্যে স্টপেজে দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছে। সব উৎসবেরই তো নির্দিষ্ট আয়ু আছে!

অনেক, অনেক রাত্রে ঘরে ফিরে যখন অবসন্ন দেহকে বিছানায় ছুঁড়ে মারলে সুভদ্রা, ঘুম এল না চোখে। রাত্রির নিশি-পাওয়া চোখে সমস্ত কলকাতা যেন দুলছে, আর সেই দোলানির ছন্দে নেচে-নেচে উঠছে তার জীবন-তরী—ছলাৎ ছলাৎ—হঠাৎ দূরের থেকে ভেসে-আসা কী এক আবর্জনার মতো একটা দুর্গন্ধ তার সারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে জড়িয়ে ধরল, বিশ্রী, বীভৎস গন্ধ। বলাই ঘোষ এলে কিংবা রামানন্দবাবু এলে যেমন গন্ধটা ভ্যাপ্‌সা হয়ে ওঠে। বিরক্তিকর নোংরা মাছির মতো গন্ধটাকে দু'হাতে ঠেলে সরাতে সরাতে সুভদ্রা আপন মনে উচ্চারণ করল 'আমি শিল্পী, শিল্পী হতে চাই··'

পূজোর আগের কয়েকটা মাস অত্যন্ত বিশ্রীভাবে এল ওদের কাছে। বাইরে তখন আসন্ন শরৎকালের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, দোকানদারদের লাল সালুর ফেস্টুনে শারদীয়ার আগমন ঘোষণা শোনা যাচ্ছে। আর এখানে, এই বাড়ির কয়েকটি জীবনের মধ্যে শরতকালটা শীতঋতুর প্রচণ্ড দরিদ্র-মূর্তি নিয়ে হাজির হল।

প্রডিউসার ঝুনঝুনওয়ালার সঙ্গে কী-এক গোলযোগে ডিরেক্টার বোসের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়েছে। স্টুডিয়োর কাজ আর নিয়মিত হয় না। হপ্তার প্রায় চারিদিনই বেকার হয়ে ঘরে বসে স্বপ্ন বুনতে হয়। দু'মাস থেকে তাদের টাকাও বন্ধ হয়ে গেছে। বলাই ঘোষ এসে একদিন শুকনো আশ্বাস দিয়ে গেল: 'সবুর কর। দু'দিন পরেই ঠিক হয়ে যাবে!'

দিন এনে দিন খাওয়া জীবন, সবুরে মেওয়া ফলতে পারে, কিন্তু তাদের জীবন শুকিয়ে যেতে লাগল। যে মুদির দোকান থেকে ওরা সওদা করত, ধার দিতে সে গররাজি হল। পটল কয়েকদিন চিৎলাঙ্গিয়ার টাকা হাতিয়ে এনে ভাগাভাগি করে' চালাল। বিয়ের জমানো টাকার থলিতেও হাত পড়ল ছবির।

কিন্তু···আর চলে না। বসে-বসে হাই তুলে দিনগুলি আর কিছুতেই কাটতে চায় না।

সেদিন স্টুডিয়োতে শুটিং ছিল মেনকার। অন্য মেয়েদের সেদিন ছিল না। যথারীতি টিনের গেট পেরিয়ে স্টুডিয়োর ভেতরে ঢুকতেই কেমন একটা সোরগোলে থতমত খেল সে। স্টুডিয়োর মধ্যে, ডিরেক্টার বোসের কামরার কাছ থেকেই যেন কোলাহলটা উঠে আসছে। কোলাহলের কোনো ভাষা নেই, একসংগে কতকগুলো মানুষ চিৎকার করলে যেমন একটা যৌথ আওয়াজ উদ্‌গত হয় তেমনি নিরাকার আওয়াজটা যেন গড়িয়ে গড়িয়ে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিল।

আরো একটু ভেতরে এগিয়ে এল মেনকা। ঠিক প্রবেশপথটায় অনেক-গুলো মানুষ ভিড় করে' দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঢুকতে যদি হয় ওদের বাধা ঠেলেই ঢুকতে হবে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল সে।

অর্ধাশনে ক্লান্তিতে এতক্ষণ মাথা ঝিমঝিম করছিল, এবার চোখের কোণ দুটো যেন ব্যথা করে উঠল।

আরে! এই লোকগুলোকেও তো চেনে মেনকা। মেয়েদের মতোই খুচরো পার্ট নিয়ে মুখে রঙ মেখে কখনো হোটেলের ম্যানেজার, কখনো বর আর রাঁধুনি সাজে, কখনো রাজপথের দৃশ্যে ভিড় হয়ে ভিড় বাড়ায়।

কিন্তু···কেন দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা! অনেকক্ষণ চুপ করে' দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে রইল মেনকা। ভেবে উঠতে পারছে না কী করবে। ওদের কি বলবে একটু সরে যেতে, না কি ফিরে যাবে আবার।

'শুনুন—'

পেছন থেকে কার কণ্ঠস্বরে বিস্মিত শ্রান্ত মেনকা ফিরে তাকাল। আর কী আশ্চর্য, সেই চোখ, দু'চোখ ভরা টলমলে বেদনা, আশ্চর্য, এই চোখকেই যেন কতদিন ধরে খুঁজেছে সে, এই ব্যথাভরা চোখের ডাক যেন কত নিশীথ রাত্রিতে তার তন্দ্রা হরণ করেছে। কিন্তু···না। অসংযত ভাবাবেগকে শাসন করল সে। বেশ বুঝতে পারছে ক্ষুধার্ত মস্তিষ্ক কেবল আজগুবি কতকগুলো স্বপ্নের ভোঁতা অনুভূতি জাগায়। তবু···এই মানুষটিকে সে যেন কোথায় দেখেছে, হ্যাঁ এখানে, এই সেটেই কোনোদিন কাজ করেছে তাব সঙ্গে, পুতুল নাচের পুতুলের মতো হেসেছে-কেঁদেছে, তারপর সেটের বাইরে অসীম অন্ধকারের তলায় সব হাসি-কান্না চাপা পড়ে গেছে। রোগা-বোগা ফর্সা, চোয়ালের হাড় দুটো উঁচু, গলাব অস্থিও বেরিয়ে পড়েছে, কেবল অস্বাভাবিক বেমানান তার চোখের দৃষ্টি, চোখ দুটো আসলে ছোটো ছোটো, কিছু কটা-কটা, কিন্তু সেই সাধাবণ চোখদুটো যখন বাঙ্ময় হয়ে ওঠে তখন চোখের আয়না দিয়ে যেন তার সমস্ত চিত্ত প্রতিফলিত হয়। বছর তিরিশের যুবক, কী যেন নাম, অরূপ।

'শুনুন—' তাকে যে কেউ 'শুনুন' বলে সম্বোধন কবতে পারে সেটাই আশ্চর্যের, 'তুমি' 'তুইই' তো তার ন্যায্য প্রাপ্য। অরূপ বলে, 'আপনার শুটিং আছে, না?'

মেনকা কোনো মতে মাথা নাড়ল।

'ক'মাস থেকে মাইনে পাচ্ছেন না?'

মেনকা কিছু উত্তর দিল না।

'দেখুন—' অরূপ অবার বললে, 'আমরাও ওই একই আগুনে পুড়ছি। আজকে প্রডিউসার এসেছে স্টুডিয়োতে, টাকার জন্যে আমরা ঘেরাও করে' আছি। বুঝতেই পারছেন, শুটিং হবার আজ আর কোনো আশা নেই।'

মেনকা ঘামছিল।

অরূপ বললে, 'কী করবেন? বাড়ি ফিরে যাবেন?'

দু' এক পা এগোতে গিয়ে পা দুটো টলে উঠল মেনকার, শরীরের

তার যেন অসহ্য লাগছে। মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল, আর চোখের সামনে কালো ছায়া দুলে উঠল, পতনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে দেয়াল ধরে' অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়াল। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার শক্ত হয়ে দাঁড়াল মেনকা। আকাশে তখন ঝিরঝিরে হাওয়ার খুশি, এক আকাশ নক্ষত্রের ডাগর চোখে অনির্বচনীয় সুধা! দেহ জোড়া অবসাদে স্নান করে' নিজেকে যেন অনেক শুচি মনে হয়।

সময় কাটে, মুহূর্ত কাটে।

এবার ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াল মেনকা।

কোথা থেকে অরূপ ছুটে এল। ওর চোখে উল্লাস, কিন্তু চোখভরা বেদনা তেমনি টলমল করছে ভোরের শিশির-বিন্দুর মতো।

'শুনুন—বোধ হয় মেঘ কেটে যাবে, প্রডিউসার আশ্বাস দিয়েছেন শীগ্‌গির পাওনা মিটিয়ে দেবেন।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ—'

স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল দুজনে। ট্রামরাস্তা পর্যন্ত হেঁটেই যেতে হবে। ভালোই লাগছিল অরূপের সঙ্গ, ওর ব্যবহারের ঋজুতা, কণ্ঠস্বরের স্পষ্টতা।

ট্রাম রাস্তায় পড়ে' অরূপ জিগ্যেস করল: 'বাড়ি ফিরবেন বোধ হয়?'

'আপনি—?' মেনকা পালটা প্রশ্ন করল।

'না। যতক্ষণ বাইরে থাকি বেশ ভালো থাকি। পুরনো শহরটাকে দেখতে মন্দ লাগে না।...আপত্তি না থাকে চলুন না, একটু গলা ভেজানো যাক।'

'না, না...'

'দেখুন, ওই দু'কাপ চায়ের দামের আর হিসেব করবেন না। আসুন, আসুন।'

একরকম টেনে নিয়ে গিয়েই রেস্তোরাঁয় বসাল ওকে অরূপ। আর নৈশরাত্রির এই অভিযানটুকুও মন্দ লাগছিল না। অপ্রত্যাশিত বলেই বোধ করি প্রীতিকর। সামান্য দু' তিন আনার বিনিময়ে যেন একটা আস্ত রাজত্বকেই মুঠোয় লাভ করা যায়। যত কথা বলছিল তার চেয়ে বেশি ধোঁয়া উড়ছিল অরূপের হাতে ধরা চারমিনার সিগারেটের। ওর ব্যবহারের মধ্যে একটা ঘরোয়া আবহাওয়া ছিল। নিমিষে কুটুম্ব-রসে ভিজিয়ে ফেলে

সমস্ত পরিস্থিতি। নিজের কথাই অনেক বলে সে, এ লাইনে আসার ইতিহাস, তিন-তিনবার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা ফেল করবার ইতিহাস। স্টেট্ বাসে কিছুদিন কণ্ডাকটারিও করেছিল, কিন্তু লেগে থাকতে পারেনি, জীবনটা অস্থির দোলকের মতো দুলছিল। দেশে থাকতে নিমাই সন্ন্যাসে নিমাই-এর পার্ট করে' মেডেল পেয়েছিল, আর ওই ঘষা মেডেলটাই ভাঙা সুটকেশ থেকে বার করে করে দেখত সে। স্টুডিয়ো লাইনে এর পর ছ'বছর ঘোরাফেরা, চটির ফিতে ছিঁড়েছে, স্বাস্থ্য ভেঙেছে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার খোঁজ আনবার জন্যে পরিচালকদের নামের শেষে 'দাদা' জুড়েছে, ধার করে' দাদাদের মদ খাইয়েছে, মেয়ে মানুষের খবর দিয়েছে। কিন্তু…কী হল? জীবনের পুরনো খোলস বদলালো না।

মেনকা বললে, 'আপনার জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করছেন কেন?'

অরূপ আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললে, 'কেন জানিনে। আমার বন্ধু-বান্ধব যারা এ লাইনে এসেছে তাদেরও জিগ্যেস করেছি, তারাও উত্তর খুঁজে পায়নি।…আচ্ছা, আপনি বলতে পারেন, কেন এ লাইনে এসেছেন?'

মেনকা ম্লান হেসে বললে, 'আমাদের কথা ছেড়ে দিন। মেয়েদের সমস্যা অন্যরকম।'

'কি রকম?'

'আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, অত পরিষ্কার করে' বুঝি না।'

অরূপ নীরবে সিগারেট টানতে লাগল। সিগারেটের ধোঁয়াটুকু প্রথমে জিভ দিয়ে ঠেলে মুখ থেকে বার করে' দিল, সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে ফ্যানের হাওয়ায় ধোঁয়াটা ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল, আর তার পরেই নিকোটিনের উগ্র গন্ধ। খুক খুক করে' কেসে উঠল অরূপ।

'চলুন, ওঠা যাক—' অরূপই বললে এক সময়।

রেস্তোরাঁর বাইরে তখন রাত্রি ঘন হয়ে নেমেছে। জনবিরল পথ, মৃদুমন্দ ট্রাম বাসের টুং টাং শব্দ।

বিজন রাত্রি সঙ্গসুধায় উচ্ছসিত হয়ে উঠল ছবির। এতদূর যে অবশেষে ছুটে আসবে কলি তার খোঁজ নিতে, কে জানত! ইশ, কতদিন দেখা হয়নি, স্টুডিয়োর কাজ যেমন ঢিমে হল, নিয়মিত প্রাত্যহিক দেখা শোনাতেও

ইতি পড়ল। অভ্যেসটা এমন পাকাপাকি হয়ে গিয়েছিল যে অনভ্যাসে খাবি খেতে লাগল ফলি, একদিন দুদিন তিনদিন—কয়েকটা হপ্তাই চলে গেল-বা। ধৈর্য চিড় খায়, কে পারে থাকতে, তাইত হৃদয়ের টানে ছুটে এসেছে সে।

ভাবতেও ভালো লাগে। সমস্ত তনু রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। শিশুর প্রগল্‌ভ আদরের মতো ওর কথাগুলো যেন বৃষ্টি শুরু করে' তার দেহ ঘিরে। কিন্তু, এসেছ, এসেছ—অত জোরে কথা বলা কেন বাপু! চোখের না হয় মাথা খেয়েছ, তাই বলে' কানের, কানেরও কি কোনো পরদা নেই? পাশের ঘরেই পটল, জেগে-জেগেই ঘুমোয়, আর ওর কানে একবার এই নৈশ আলাপনের ছিটে প্রবেশ করলে, ও কি আর আস্ত রাখবে কিছু! আস্তে, আস্তে বুঝলে, অন্ধকারে এসেছ অন্ধকারেই বিদায় নিও, এমনিতেই ওদের কানাকানি, তারপর টেরটি পেলে হাট বানিয়ে তুলবে। বাবা! রস তো কম নয়, থৈ থৈ করছে যেন, বেশি রসে পাক দিয়ো না গো, গেঁজে তাড়ি হয়ে যাবে একেবারে। কে বলেছিল বেলফুলের মালা আনতে, ধাড়ি মেয়ে খোঁপায় ফুল গুঁজে আমি কি রঙ্গিলা হব, মরণ আর কী! আহা, অমনি বদন হাঁড়ি পানা হল। বেশ পরছি গো, পরছি। পুরুষমানুষের সখ তো নয় ছেলেমানুষির বাড়া! আহা, আস্তে আস্তে, আবার—কথা শুনছ না কেন। সেইযে কথায় আছে: বসতে পেলে শুতে চায়—সেই বিত্তান্ত।

কথা থামে, ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে আসে, কথার অতীত যেখানে না-বলা বাণী অকথিত অরণ্যের ফুল হয়ে ওঠে, কুঁড়ি থেকে ফুলে, পাতায়, বিচিত্র-বর্ণে, বেদনায় আর আনন্দে, উত্তেজনার আর হৃদয়ের উষ্ণতায়। মন পরিপক্ক ফলের বেদনার বন্ধন ভাঙবার জন্যে ছটফট করে' ওঠে, অন্ধ মাতৃত্বের মতো একটা মরীয়া বাসনা দুর্বার হয়ে ওঠে দেহদুর্গ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে। সমস্ত শরীরটা যেন পাখির পালকের মতো হাল্‌কা হয়ে-হয়ে বায়ুস্তরে উড়ে বেড়াতে থাকে, আর বন্দী অসহায় ইচ্ছাগুলি যেন নিজেদের মধ্যেই মাথা কুটতে থাকে। কিশোর বয়েসে একবার মায়ের সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে গিয়ে চোরাবালির আবর্তের মধ্যে পড়ে, পাশুদ্ধ নিচের শরীরের অনেকখানি গেঁথে গিয়ে এমন অনুভূতি হয়েছিল। মা তখন গঙ্গায় ডুব দিচ্ছেন পুবদিকে মুখ করে' আর আমি পেছনে তলিয়ে যাচ্ছি বালুশয্যায়

তলায়, ছটফট করছি, যতই উঠতে চাইছি ততই তলিয়ে যাচ্ছে আমার অস্তিত্ব, কাঁদব কী, ভয়ে আশংকায় একেবারে মূক হয়ে গেছি, তারপর অবশ্য দু' একজন স্নানযাত্রী এসে অনেক কষ্ট করে' আমাকে উদ্ধার করে।

হঠাৎ পুরানো স্মৃতিটাই যেন মুখব্যাদান করে' ওঠে। না, না, তলিয়ে যাবে না সে, বড় কষ্ট, সে যে বড় কষ্ট! ওগো—তোমার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দাও, আজ নয় লক্ষ্মীটি, আমার সোনা, আমার যাদু, কথা শোনো। না-না-না…একটা অব্যক্ত শীৎকার, ছটফটানি, খালি পায়ে শরতকালের দুর্বা ঘাসের বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে-যাওয়া, প্রাণপণ শক্তিতে ওকে বাধা দেবার চেষ্টা করল ছবি, কিন্তু তার আগেই তার আপন বাধাই বালুর দুর্গের মতো ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, কী করে' বাধা দেবে সে, ওযে ভালোবাসে, আর যেখানে ভালোবাসা সেখানে শরীরের বাধা আপনিতেই বিলীন হয়ে যায়…রাত্রির মূর্চ্ছাহত অনুভূতিচেরা বেদনা, আর দূরের থেকে ভেসে-আসা বৃষ্টির একটানা শব্দ, যেখানে পৃথিবীর শেষ, তারপরেই অসীম অন্ধকার জটাজাল, আর সেখানে উগ্র কাঁটালচাঁপার ভারি গন্ধ চোখের পাতা বুজে আসে, তলিয়ে যায় সে, ঘুমের, ঢেউয়ের, বিস্মৃতির বালুশয্যায় ·

আবার কাকের ডাকে ভোর আসে। রাত্রিজাগর চোখের কাজল মুছে ফেলে দিনের আলোকে প্রাতঃপ্রণাম। ভোর থেকে সকাল, সকাল থেকে দুপুর, তারপর বিকেল—রোদের রঙ পালটাতে থাকে। ঘরে বসে বসে হাঁপ ধরে, খারি খায় মন।

পটল উঠে দাঁড়াল, সাজগোজ করে' এসে বললে, 'আমি বেরোচ্ছি ভাই—' শরীরটাকে অসম্ভব প্রখর করে' সাজিয়ে শাড়ির ঢেউ তুলে বেরিয়ে গেল সে।

আর বেরিয়ে যাবে কোথায়! সেই চিৎলাঙ্গিয়ার দোকান।

চিৎলাঙ্গিয়া তাকিয়াটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে বললে, 'এস এস। বহুৎ দিন দর্শন নেই তোমার।'

পটল মুখ টিপে হাসল। বললে, 'ব্যস্ত ছিলাম যে।'

'এত্না ব্যস্ত যে দেখাশোনার ফুরসৎ নেই, আরে ব্বাপ!' চিৎলাঙ্গিয়া সশব্দে হেসে উঠল।

পটলও মুখ টিপে হাসল। খঞ্জনী পাখীর মতো চোখের চঞ্চল তারা ঘুরতে লাগল দোকানের চারপাশে, শাড়ি কাপড়ে রঙ বেরঙের ভিড়ে, দু' একটা পাইকার-খদ্দেরের দিকে, আর যেখানে প্রেম খদ্দেরদের দেখাশোনা করতে-করতে অপাঙ্গে এক একবার তাকিয়ে নিচ্ছে পটলের দিকে—সেখানে। প্রেমের চোখে কুতূহল আর উত্তেজনা। আর এই কুতূহল ও উত্তেজনা বাড়ছে পটলের ভ্রূভঙ্গীতে, মুখটেপা হাসিতে, কথাব আওয়াজে।

দোকানের ভেতর থেকে ফোনটা বেজে উঠল।

দিলসুখ বললে, 'একটু বসো।' ফোন ধরতে ছুটে গেল সে।

আর এই সুযোগ। আড়ালে-আবডালে ঢিল-ছোঁড়ার, তীব-নিক্ষেপের।

প্রেম এগিয়ে এল খদ্দেব ফেলে। হাসি হাসি মুখ।

'শাড়ি দেবো? মাদ্রাজি?'

চোখ মটকে পটল জবাব দিল: 'মস্করা হচ্ছে? বলব বাপকে? দেখবে মজা?'

'ব্বাপরে! মেয়ে তো নয়, চাবুক...'

'বুদ্ধু, একদম বুদ্ধু। শোন্—কটায় গদি বন্ধ হচ্ছে? সাড়ে আট। প্যারাডাইস সিনেমার সামনে, ঠিক নটায়, আঁ?'

প্রেম বললে, 'বলব বাপকে, এ্যাঁ?'

পটল হাসল। 'ব্বাপবে! শয়তান ··যা ভাগ্, খদ্দের স্থাখ।'

প্রেম সরে গেলো।

দিলসুখ ফোন ছেড়ে দোকানেব সামনে এল। মাথায় পাগড়িটা ঠিক কবে' পবে' নিল। আতবের তুলোটা কানে গুঁজে নিয়ে প্রেমকে কি-একটা হুকুম খশিয়ে পটলেব দিকে ফিবে বললে, 'চলো—'

চিত্তরঞ্জন এভিনিউব একটি ফ্ল্যাট বাডিব সামনে গাডি থেকে নামল দুজনে। ছ'তলা বাড়ি।

'এই সেই ফ্ল্যাট—' দিলসুখ বললে 'বাস্তাব দিকেব একতলাটা ভাড়া নিয়েছি, আব দোতালায় কয়েকটা ঘব, সাতশো টাকা, সেলামী দু'হাজার··'

'এত ভাড়ায় বাড়ি নিলে কেন? বাড়ি কিনলেই তো পারতে।' পটল বললে।

দিলসুখ হাসল। 'আরে ছোঃ, আমি কি বঙাল-ব্যবসাদার আছি, দুপয়সা হল কী বাড়ি কিনে ফেললে, পুঁজিপাট্টা সব ব্লকড্ করে' রাখলে, তারপর ব্যবসা উবসা চলে না, কাহে, না টাকা নেই, তো কী হল, বাড়ি মর্টগেজ পড়ল, বাড়ি বাঁধা পড়ে' রূপেয়া এল, ব্যবসাও ভি গেল, বাড়ি ভি গেল।'

একতলার বিরাট হল ঘরটা ঘুরে ঘুরে, দেখাতে লাগল দিলসুখ। রাস্তা-মুখী ঘর, সিঁড়ি থেকে নেমেছ কি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ। বৌ-বাজারের খদ্দেরও মিলবে, চাইনিস, বাঙালি বাবু, এ্যাংলো, মোছলমান, হিন্দুস্থানী—ভদ্র থেকে ইতর, ধনী নির্ধন, মধ্যবিত্ত, সকলেরই নাগালে থাকবে এই হোটেল-রেস্টুরেণ্ট। বাঙালি ডিশ, ইংরেজি ডিশ, চাইনিস ডিশ তো থাকবেই, দরকার হলে পাইস সিস্টেমেরও ব্যবস্থা থাকবে।

পটল হেসে বললে, 'তলে তলে এত ফন্দি-ফিকির তোমার, বাপরে! কাপড়ের গদিতে কুলোল না, এবার হোটেল।'

দিলসুখ বললে, 'আরে, কাপড় পিন্‌লেই হবে, পেটের খাবার চাই না? আগে ভাত-রোটি, না কাপড়া, অঁা?'

পটল বললে, 'তা আমাকে কি তোমার হোটেলের চাকরাণি রাখবে?'

'আরে রাম, রাম! তুমি তো লছমি, বঙ্গলছমী—তোমার নামে হোটেলের নাম রাখব: 'বঙ্গলছমি হোটেল', তুমি থাকবে আমার এই ব্যবসার পাটনার...'

পটল চোখ মটকে বললে, 'বেশ তো আমাকে তোমার হোটেলের সামনে টাঙ্গিয়ে রেখো, হোটেল জোর চলবে?'

হা-হা করে' হেসে উঠল দিলসুখ'। তারপর হাসি থামিয়ে বললে, 'পুজোর পরেই এই হোটেল চালু করব। যতদিন না চালু হয় তুমি দোতলার ফ্ল্যাটে থাকবে।'

'কেন আমার কি ঘর নেই যে তোমার ফ্ল্যাটে থাকব? হোটেল করছ হোটেল করো। তোমার হোটেল দেখবে, না আমাকে দেখবে?'

'আরে বাবা, তোমার মাথায় কিছু নেই। আমার হোটেল আর তুমি কি জুদা আছ? হোটেল তো তোমার। আমি মরে গেলে প্রেম কি তোমাকে দেখবে? এই হোটেলের আয় থেকেই তো তোমাকে বাঁচতে হবে...'

পটল চুপ করে' গেল।

কিন্তু...কটা বেজেছে? এবার যেতে হয়। প্রেমকে অপেক্ষা করতে

বলেছে নটার সময় প্যারাডাইসের সামনে। ছোকরা আসবে নির্ঘাত্। আনকোরা একটা ছোকরার সঙ্গে নৈশ অভিযানটা জমবে মন্দ নয়।

'আমি আজ চলি দিলসুখ—' পটল উঠে দাঁড়াল।

'সে কি! এত্ মা জল্দি। নটাও তো বাজেনি এখনো।'

'না। একটু কাজ আছে। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।'

'আরে ছোড়ো লছমী—কাম কাম কাম—চলো ওপরের ফ্ল্যাটটা দেখাই—' টেনে নিয়ে চলল দিলসুখ।

দক্ষিণমুখী ঘর। পাশাপাশি দুটো কামরা। বাথরুম লাগোয়া, কীচেনও আছে। ঘরটা লোভজনক, কিন্তু এত লোভ বোধ হয় পটলের পক্ষে ভালো নয়। তবু ঘর দেখতে হল, সুবিধাগুলি বেশ ভালো করে' বুঝিয়ে দিল দিলসুখ। যেমন নির্জন, নির্ভাবনা, তেমনি আরাম আর তৃপ্তি।

কিন্তু···উঠতে হয়। ওদিকে সময় আর হাতে নেই। প্রায় নটা বাজে। উশখুশ করতে লাগল, চঞ্চল হয়ে উঠল পটল। দিলসুখ যেন ধৈর্যের আর সহনশীলতার বৃদ্ধ বটগাছ। দরোয়ান মারফত সামনের হোটেলে খাবারের অর্ডার দিল সে। খাবার-খাওয়ানোর চেয়েও যেন স্বেচ্ছাকৃত এই টালেমির প্রতি আজ একটু অস্বাভাবিক রকমের প্রশ্রয় ছিল তার। যেন পটলের সমস্ত অধৈর্য আর চঞ্চলতাকে ধৈর্য এবং স্থৈর্য দিয়ে উপভোগ করতে চায় সে। নাকি, ওর মনে কোনো সন্দেহ দানা বেঁধেছে।

ঢঙ ঢঙ করে' দূরের থানা থেকে রাত্রি নটার ঘণ্টা বাজবার সংগে সংগে যেন বুকের হৃদ্পিণ্ডটা নেচে উঠল পটলের। সমস্ত রক্তের উচ্ছ্বাস যেন তার সারা মুখমণ্ডলে জমে উঠল, দাঁতে দাঁতে এঁটে উত্তেজনাকে দমাবার চেষ্টায় অনেক শ্রান্ত অবসন্ন মনে হল তাকে।

অদূরে গড়ের মাথার ওপরে পশ্চিমাকাশ রক্তে রঙিন হয়ে উঠেছে, ছেঁড়া ছেঁড়া লাল মেঘগুলো যেন অনেক সম্ভাবনার ফুল। জাহাজঘাটি থেকে হয়তো কোনো যাত্রাউন্মুখ জাহাজের সীটি বেজে উঠল, বাঁশির রেশটা হাওয়ার কাঁপতে কাঁপতে দূর দিগন্তে ছড়িয়ে গেল।

এলোমেলো হাওয়া বইছে, মুখে চোখে স্খলিত চুলগুলো উড়ে এসে

পড়ছে। হাঁটুর ভাঁজে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল মেনকা। নিঃশব্দে বসে থাকলেও ওর মনের রাজ্যে নৈশব্দ্য ছিল না। ভাবনাগুলি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, খেই হারিয়ে যাচ্ছে মনের গ্রন্থির। কী চায়, কী চায় সে! ওইতো পাশে বসে রয়েছে অরূপ, তেমনি সহজ, তেমনি স্বচ্ছন্দ। ওর চারমিনার সিগারেটে উগ্র গন্ধ…স্টুডিয়ো থেকে কিছু টাকা মিলেছে, তার চেয়ে বেশি মিলেছে শুকনো আশ্বাস। কিন্তু এই আশ্বাস টেনে আর কতদিন বাঁচা যায়।

'না, এইভাবে চলতে পারে না…' সিগারেটের শেষটুকু দূরে ছুঁড়ে দিয়ে অরূপ বললে।

'সত্যি চলতে পারে না…' মেনকাও যোগ দিল তার কথায়।

কিন্তু…পথ কোথায়?

অরূপ ম্লান হেসে বললে, 'ওই ঘষা মেডেলটাই কাল হয়েছে, বুঝলেন। কিছুতেই ওর শোকটা ভুলতে পারিনে।…আর যত সবাই মিলে আমাকে বোঝাতে চায় ততই যেন বোধটা চেপে বসে। আসল ব্যাপারটা কি জানেন, যেদিন আমি এই লাইনে নাম করব, মুঠোমুঠো টাকা আনব সে-দিন কিন্তু এগিয়ে এসে আমাকে তারিফ করতে কেউ ভুলবে না।' বলে' এমনভাবে সিগারেট ধরাল যেন বোঝাতে চাইল নাম করাটা তার সিগারেট-টানার মতোই সহজ ব্যাপার।

মেনকা সুমুখের আসন্ন ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে চুপ করে' রইল।

অরূপ আবার বললে, 'আপনি হাসছেন তো? ভাবছেন একলা পেয়ে কেবল পাগলামি করে যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।'

মেনকা হেসে বললে, 'না…'

'কি, না?'

'আপনার মতো তো আমার বিশ্বাসের জোর নেই।'

'কেন?'

'আমরা লোনা দেশের মানুষ…মাতলা নদী ফিবছরই আমাদের ঘর ভাঙে, কাজেই বিশ্বাস করব এমন জোর কোথায় পাব বলুন?'

'ভালো কথা, আপনার নিজের জীবনের কোনো কথাই তো আমাকে বলেন নি, নাকি বলতে চান না?'

মেনকা বললে, 'বলবার মতো এমন কোনো জীবন আমার নেই। বুঝতেই পারছেন, আমি অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে, একেবারে আটপৌরে।'

অরূপ বললেন, 'এটা হল আপনার এড়িয়ে যাওয়া।'

মেনকা বললে, 'না। সত্যি বিশ্বাস করুন। এই লাইনের আরো দশটা মেয়ের মতোই আমার জীবন। কোনো স্বপ্ন দেখি না, আশাও করিনে। আমার যে এই লাইন ছাড়া বেলাইনে যাবার কোনো উপায় নেই অরূপ বাবু।' সন্ধ্যার বাতাসে থরথর কেঁপে উঠল ওর কথাগুলি।

অনেকক্ষণ দুজনে মৌন।

সূর্য কিছুক্ষণ আগেই ডুবে গেছে। লাল রঙ হারিয়ে পশ্চিমাকাশ আবার নিজস্ব রঙ ফিরে পেয়েছে। দু'একটা তারা সন্ধ্যাবধূর কৌতুক নিয়ে চোখ মিটমিট করছে। কয়েকটা মোটর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল, আলিপুরের ট্রামটাও ঘন্টি বাজিয়ে বিদায় নিল।

'চলুন, ওঠা যাক।' অরূপ ফিশফিশ করে' বললে।

'না। একটু বসি।' তেমনি ঘাড় গুঁজে বসে রইল মেনকা।

আবার একটা সিগারেট ধরাল অরূপ। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে থেমে-থেমে বললে, 'আচ্ছা, সময় সময় খারাপ লাগে না আপনার, খুব বাজে বাজে লাগে না, এইভাবে বেঁচে থাকতে?'

মেনকা বললে, 'না। লাগে না।...আমি এর চেয়েও খারাপ ভাবে বেঁচেছি...'

'এর চেয়েও খারাপ...?'

'হ্যাঁঃ এর চেয়েও খারাপ' মেনকাব কণ্ঠে দৃঢ়তাঃ 'জানেন তো আমাদের দেহটা মনের চেয়ে আগে বাড়ে। আমার মন দেখে আমার বয়েসের, শুধু আমার কেন, কোনো মেয়েরই বয়েসের বিচার চলে না। কিন্তু যেদিন জানতে পারি সেদিন আর ফেরার পথ থাকে না...'

অরূপ নীরবে সিগারেট টানতে লাগল।

মেনকা ক্ষীণ হেসে বললে, 'নিশ্চয় ঘৃণা হচ্ছে আমার সম্পর্কে?'

হা হা করে' হেসে উঠল অরূপ। হাসল না যন্ত্রণায় চিৎকার করে' উঠল, কে জানে। তারপর হাসি থামিয়ে বললে, 'এমন একটা দামী ধারণা করেছ আমার সম্পর্কে যে সত্যিই নিজেকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে। ওঠো, ওঠো। আজ তোমাকে চা খাওয়াতেই হবে।'

'আঃ হাত ছাড়ো, লাগে যে—'

হাত ছেড়ে দিয়ে অরূপ বললে, 'মনে থাকে যেন। আর কক্ষণো 'আপনি' বলতে পারবে না।'

পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে আবার সেই প্রশ্নটা ফিরে ফিরে উঁকি মারতে লাগল মেনকার মনের মধ্যে: কী চায় সে! গ্যাসবাতির আলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার অরূপের আলোকোজ্জ্বল মুখের দিকে ভালো করে' তাকাল সে। তেমনি হাসি-হাসি মুখ আর সেই বেদনায় টলমল দুই চোখের তারা! বেদনা আর আনন্দ, অশ্রু আর জয়। ছোটবেলায় এমনি এক দেবতার কল্পনা করত মেনকা শিবরাত্রির জাগর মুহূর্তগুলিতে। এক চোখে বরাভয় অন্য চোখে অশ্রু সাগরের ঢেউ।

রাত্রির অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকতে আজ আর বস্তিটাকে খুব ছোটো মনে হল না মেনকার। একরাশ তারা ভরা আকাশের তলায় সমস্ত বাড়িটা যেন রাতারাতি একটা অট্টালিকা হয়ে উঠেছে। কাঁচা নর্দমার গন্ধ ঠেলে রাতের শজনে ফুলের গন্ধ যেন যুঁইয়ের গন্ধের মতো মনে হচ্ছে। আর মনে হচ্ছে এ বাড়িব এক-একটি ঘরে রয়েছে যে সব মেয়েরা তাবা যে কোনো অচিনদেশেব রাজকন্যেকেও হার মানায়। নিজেব কল্পনাব অজস্রতায় আপন মনে হাসল মেনকা, গভীর খুশিতে উচ্ছসিত হয়ে উঠল তার চিত্ত।

সারা রাত আধো ঘুমে আধো জেগে স্বপ্ন দেখল মেনকা। ঠিক কী স্বপ্ন দেখল পরিষ্কার করে' বলা যায় না। কখনো মনে হল ভোরের তন্দ্রা জড়িত কুয়াশায় পথ হাতড়ে চলেছে, সুমুখে নীল নদী, পারাপারের একটি মাত্র ডিঙ্গি নৌকা, ঝিরঝির ঝরা যুঁইয়ের মতো বৃষ্টি, চোখ মুখ নাকের ডগা, তারপর সমস্ত শরীর, বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি···তারপর আবার স্বপ্নের দৃশ্যপট বদলে গেল: ভূমিকম্পের ধ্বংসের এক স্তূপের নীচে তার দেহটা চাপা পড়ে গেছে, মুখটা শুধু হাঁ করে' নিশ্বাস নিচ্ছে, ক্রমশ দম বন্ধ হয়ে আসছে, যন্ত্রণা, ভীষণ যন্ত্রণা···তারপর, তারপর স্বপ্নের দৃশ্যগুলি কেমন ছিঁড়ে খুঁড়ে গেল, আর, বিপুল শব্দ, শব্দের হযবরল, কানের কাছে কারা যেন কানেস্তারা পিটছে, লিচুগাছ থেকে বাঁদর তাড়াবার জন্যে যেমন পাহারাদার কানেস্তারা পিটতে থাকে।

কানেস্তারা তো নয়, দরজার বাইরে থেকে সত্যিই কারা যেন চিৎকার করছে। রাত্রির অন্ধকার তখন ফ্যাকাসে হয়ে এসেছে।

'মেনকা অ মেনকা—'ছবি পটলের গলা। উর্ধশ্বাস, উত্তেজিত।

স্বপ্নের জের তখনো মুছে যায়নি মন থেকে, চোখ থেকে। ফ্যাল ফ্যাল করে' ধূসরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল মেনকা কিছুক্ষণ। তারপর অকস্মাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল, দরজা খুলে দাঁড়াতেই ছবি চিৎকার করে উঠল : 'মেনকা সব্বনাশ হয়েছে, বিন্দু…'

'এঁ্যা!' সমস্ত শরীরটা একটা অজানা আশংকায় কেঁপে উঠল মেনকার, আর দাঁড়াল না, বিন্দুর ঘরের দিকে দৌড়ে গেল, চৌকাঠে পা দিতে গিয়ে বিদ্যুতস্পৃষ্টবৎ দাঁড়িয়ে রইল মেনকা, পাংশু, বিশুষ্ক মুখ। স্তব্ধ স্তম্ভিত—চোখের সামনে যেন তাদের সমস্ত সুখানুভূতির বীভৎস নাটকীয় চেহারাটা নাড়া দিয়ে উঠল। উলংগ, কুৎসিত, দাঁতের বিষম চাপে বেরিয়ে-পড়া দীর্ঘ জিহ্বা, কুঁকড়ে ছোটো হয়ে আসা দেহটা, শাড়ির বন্ধনে পেঁচিয়েওঠা কণ্ঠের শিরা প্রশিরাগুলি, চোখের কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা আঁখি-তারকা।…'কুন্দনন্দিনী মরল'…কী বোকা মেয়ে, ওদিকে ওর স্যুটিং চলেছে কুন্দর পার্টের, ডিরেক্টার বোস মেতে উঠেছিলেন ওকে সৃষ্টি করতে, আর সেই সৃষ্টির যজ্ঞশালায় তিল তিল করে' তিলোত্তমার মতো রূপ নিচ্ছিল বিন্দু…

'বিন্দু, বিন্দুরে…'অনেকক্ষণ পর ডুকরে কেঁদে উঠল মেনকা।

নির্জনতা। কবরের ভয়াবহ নির্জনতা। আর নিঃশব্দতা চিরে মেনকার চাপা ক্রন্দনের একটানা রোল সমস্ত আবহাওয়াকে সিক্ত করে রাখল।

ছবিরই হঠাৎ চোখ পড়ল। বিন্দুর তক্তপোশের নীচে দুমড়ানো পাকানো কী একটা কাগজ, কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে পড়তে লাগল ছবি। চিঠি। বিন্দুর স্বামীর দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছে। জেল হাসপাতালে কয়েকদিন রোগে ভুগে নিবারণ মারা গেছে।

পুলিশ এসে লাশ্ নিয়ে যাবার পর সময় ও সুযোগ বুঝে ছবি মেনকাকে বললে, 'মেনকা দে, যাব ডিরেক্টার বোসের কাছে, কুন্দর পার্টে একবার যদি আমাকে চান্স দেয়…'

মেনকা আশ্চর্য ব্যথাভরা গলায় ভৎ'সনা করে' উঠল : 'ছি ছি, একটি বেলাও পোয়াল না, এরই মধ্যে তুই…'

ছবি একটু চুপ থেকে বললে, 'ও হতভাগী তো মরে গিয়ে সব সমস্যা চুকিয়েছে, বেঁচে যখন আছি আমাদের আখের তো ভাবতেই হবে…'

মেনকা কোনো জবাব দিল না।

ছবি আবার বললে, 'জানি আমাকে ছোটো ভাবছ, নীচ ভাবছ। কিন্তু এছাড়া উপায় কী বলো? শোভা মাসি গেল, বিন্দু গেল, বলা যায় না হয়তো একদিন আমিও যাব, কী করা যায়, কী করতে পারবে তোমরা?'

'চুপ কর, চুপ কর ছবি। আমাকে একটু একলা থাকতে দে।' বিড় বিড় করে' বলে উঠল মেনকা।

ছবি আর কথা বাড়াল না। ধীর পায়ে সরে গেল।

নিঃশব্দে পা ছড়িয়ে মেঝের ওপর তেমনি করে' বসে রইল মেনকা। দুপুরের গাঢ় রোদ ফ্যাকাসে হয়ে বিকেলের তরলতায় মিলিয়ে যাবার পর, সারা দিনের গুমোট ভেঙে শজনে ডালে হাওয়া ওঠবার পরেও যখন দু' একটি তারা সন্ধ্যার আকাশে দীপ্র হয়ে উঠল এবং আলোহীন ঘরে অন্ধকার জমে-জমে সমস্ত ধৈর্যগুলি পাথর হয়ে এল তখন একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল মেনকা।

এর দু' একদিন পর এক সকালে পটল সাজগোজ করে' পানের রসে ঠোঁট রাঙিয়ে এসে বললে, 'ও মেনকা ও ছবি, আমি চললাম ভাই—'

'চললি? কোথায় চললি?'

'আর যাব কোন চুলোয়?' হেসে-হেসে বললে পটল : 'দিলসুখের ওখানেই যাচ্ছি। সেনট্রাল এভিনিউতে ওর ফ্ল্যাটে—'

ওরা দুজনে চুপ করে' রইল।

পটল আবার বললে, 'কী, কথা কইছিস নে কেন? যেতে যখন হবে চোখে রঙ থাকতে-থাকতে যাওয়া ভালো। বয়েস হল, ভবিষ্যত ভাবতে হবে তো…'

পটল বেরিয়ে গেল, গলির মোড়ে ওর রিকশার টুং টাং ক্রমশ মিলিয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ দুজনে মূক হয়ে বসে রইল।

দিন গড়িয়ে চলল।

অনেক রাত—অনেকদিন।

ডায়মণ্ডহারবার থেকে রাত্রির ট্রেনটা ছুটে চলেছিল। সিঙ্গল লাইন, আর লাইনগুলিও বোধহয় এদিকে কমজোরি। গতিবেগ বাঁধা, ইচ্ছে থাকলেও বাড়ানো যায় না। ছবির মতো উঁচু বাঁধ-ঘেরা ছোট্ট শহরটি পেছনে সরে-সরে যেতে লাগল। নির্জন রাত্রির বুক চিরে খোলা মাঠের মধ্যে দিয়ে ট্রেন ছুটে চলল।

জানালা দিয়ে ভিজে হাওয়া এসে নাকে লাগছে। চুল উড়ছে, চোখের পাতায় শিহরণ।

'জানালা বন্ধ করে' দেবো?' পরিমল সান্যাল জিগ্যেস করলেন।

'না। থাক।' সুভদ্রা জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিল।

বাইরে নির্জন রাত্রি। আকাশে তারাদের কৌতুক।

দিগন্তে নারকেল, কলা আর পেয়ারা গাছের জটলা। আর ভিতরে ফার্স্টক্লাশের কামরাটা আরো নির্জন। যাত্রী বলতে দুজনেই। নতুন ছবিটির কতগুলো আউটডোর শুটিং ছিল। বিকেলের মধ্যেই কতগুলো শট্ নেওয়া হয়েছে। টেকনিসিয়ানরা গাড়ি করেই কলকাতায় পৌঁছে গেছে এতক্ষণ। একটু বেড়িয়েছে দুজনে, হুগলী নদীর বাঁধের ধারে, হাঁটতে-হাঁটতে অ—নেক দূর। তারপর একটা হোটেলে ঢুকে কিছু খেয়েছে, গল্প করতে-করতে সন্ধ্যে উৎরেছে, রাত্রি ঘন হয়েছে, শেষ ট্রেনে কলকাতা ফিরে চলেছে।

'কেমন লাগছে?' সান্যাল জিগ্যেস করলেন।

'এ্যাঁ!' অন্যমনস্কের মতো একটু চমকে উঠল সুভদ্রা। কে জানে কি ভাবছিল, তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে হেসে বললে 'কি?'

হাতের সিগারেটে টান দিয়ে অনেকক্ষণ ধোঁয়া ছেড়ে সান্যাল বললেন, 'ছবিতে তোমাকে যে রোলটা দিয়েছি, পছন্দ হয়েছে তো?'

সুভদ্রা হাসল। বললে, 'আপনাকে খুশি করতে পারলেই আমার পুরস্কার।'

সান্যাল বললেন, 'আমাকে খুশি করে তো তোমার যথার্থ পুরস্কার মিলবে না। আর তাছাড়া, আমাকে খুশি করতে পেরেছ তো বটেই নইলে এতবড় রোল তোমাকে দেবো কেন ?'

সুভদ্রা চুপ করে' রইল।

পাঞ্জাবীর পকেট থেকে আবার তরল ওষুধের শিশিটা বের করে' ঢক ঢক করে' গলায় ঢেলে দিলেন পরিমল। বাতির আলোকে চক চক করছে ওঁর চোখের তারা। লাল হয়ে উঠেছে সারা মুখ।

সান্যাল আবার জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা কেমন লাগছে বললে না তো ?'

অমরজিত মুখটা সান্যালের দিকে ফিরিয়ে সুভদ্রা আবার বললে, 'কি ?'

'এই রাত্রির ট্রেন জার্নি…'

'ভালো।'

'শুধু ভালো আর কিছু নয়…'

'আমি লেখক নই, ভালোকে ভালো ছাড়া আর কী বলব ?'

'তুমি নিদারুণ চালাক মেয়ে…' সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করতে-করতে সান্যাল বললেন। 'এই রাত্রির ট্রেনে একটা জাদু আছে। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে এইরকম এক ট্রেন জার্নির ওপর একটা গল্প লিখেছিলাম। তাতে দেখিয়েছিলাম: ছুটন্ত ট্রেনের গতিবেগ এমন একটা প্রচণ্ড সত্য যে সেখানে মাটির পৃথিবীর কোনো সংস্কার কাজে লাগে না। সেদিনও এমন নির্জন রাত্রি, ঠাণ্ডা হিম-হিম আকাশে তারাদের দ্যুতি, অধ্যাপক আর ছাত্রী…ওকী, কী হল ?' কথা থামিয়ে পরিমল জিগ্যেস করলেন।

সুভদ্রা বললে, 'না। কিছু নয়। মাথাটা কেমন করে' উঠল।'

পরিমল ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন, 'দেখি টেমপারেচার ওঠেনি তো ? সারাদিনে পরিশ্রম তো কম যায়নি। ফ্যানটা ঘুরিয়ে দিই—আর জেগে না থেকে শুয়ে পড়…'

সুভদ্রা শরীরটাকে আলগা করে' একটু কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। মাথার ওপরে আলোটা বড় বিশ্রী লাগছে। আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যদি কামরার মধ্যে জমাট অন্ধকার নেমে আসত। চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে নিঃসাড়ে পড়ে' রইল সে।

ঝাঁকুনি দিয়ে কোন্ এক স্টেশনে গাড়ি থামল। চোখের ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে পরিচালকের দিকে তাকাল সুভদ্রা। হাতের ক্লিপটা সরিয়ে

সামনের দিকে দৃষ্টি ছুঁড়ে কী ভাবছিলেন, হঠাৎ সুভদ্রার চোখের দীপ্তিতে পরিচালকের ধ্যানী চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। হাসলেন তিনি!

'ঘুম আসছে না?'

'না—'

'বাথরুমে গিয়ে একটু চোখেমুখে জল ছিটিয়ে এস। চা খাবে? আমার ফ্লাস্কে চা আছে।'

'না—'

'না করলে চলবে কেন? কালকে তো আবার শুটিং আছে।' সান্যাল উঠে দাঁড়ালেন।

রাত্রির ট্রেন আবার ছুটে চলল।

পরিচালক এসে বসলেন সুভদ্রার মাথার কাছে। সুভদ্রা উঠে বসবে ভাবল, ভালো লাগল না। নেশার মতো সমস্ত শরীরটা কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে। আর সান্যালের আঙুলগুলো যেন কথা বলতে পারে, নরম আঙুলের চাপে চুলগুলি ঘসে-ঘসে দিচ্ছেন তিনি, চুল থেকে কপালে, চোখের পাপড়িতে নাকের ডগায়, বুঝি বা ঠোঁটে।

'ঘুমোবার চেষ্টা করো। বুঝলে? এখনো ঘণ্টা দুয়েক দেরি করবে গাড়িটা…'

চোখ বুজে অসাড়ের মতো পড়ে রইল সুভদ্রা। পাশে-বসা মানুষটির অস্তিত্ব বড় বেশি সচেতন করে' তুলছে তাকে। আর সমস্ত কিছু ছাড়িয়ে সিগারেটের উগ্র গন্ধটা তাকে মাতাল করে' তুলছে।

'আলোটা চোখে লাগছে, না? এই আলোটা নিবোনোও যায়, জানো? নিবিয়ে দেবো—'

সুভদ্রা কোনো উত্তর দিল না।

সান্যাল সুইচ টিপে আলোটা নিবিয়ে দেবা-মাত্রই অন্ধকারে সমস্ত কামরাটা যেন লেপে মুছে একাকার হয়ে গেল। আর অন্ধকারটা যে এতো সহজ, নির্ভয়, কে ভেবেছিল আগে। নরম সাবানের ফেনার মতো তরল ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল সুভদ্রার চোখ, দেহ, সমস্ত অস্তিত্ব।

ট্রেনের গতিবেগের দোলায়, ফ্যানের ছন্দে সময় আবর্তিত হচ্ছিল। সময়-সমুদ্রে নিজেকে যেন এক বুদ্‌বুদের মতো মিথ্যা মনে হচ্ছিলো সুভদ্রার। ঘুম-ঘুম আচ্ছন্নতাই বোধ করি গ্রাস করে' ফেলেছিল তাকে।

হঠাৎ ধড় মড় করে' উঠে দাঁড়াল সুভদ্রা।

'কী হল, কী হল তোমার?' মুখের কাছে মুখ নিয়ে ফিশ ফিশ করে' বললেন সান্যাল।

অন্ধকারে ঠাহর করে' বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল সুভদ্রা। দরজার চাবি খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। কয়েকটা মিনিট। টলতে টলতে বেরিয়ে এল আবার। সেই নির্জন বার্থ, পাশে-বসা চল্লিশ বছরের সাহিত্যিক-পরিচালক, মুখে জলন্ত সিগারেট, অন্ধকারে ওষুধের শিশি বের করে ঢক ঢক করে তরল পানীয়টুকু গিলে ফেললেন তিনি। ক্লান্ত শ্রান্ত শরীরটাকে নির্লজ্জের মতো বার্থের বুকে মেলে ধরল সুভদ্রা। ঘুম। আসুক। আজ রাত্রে জেগে থাকবার লোভ নেই তার। ঘুম ঘুম অন্ধকার আছড়ে পড়ল তার শ্রবণেন্দ্রিয়ের দু'ধারে। অন্ধকারের প্লাবন...পৌরুষের মতো অন্ধকার...হা-হা করা উদ্দাম কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো...তার দীর্ঘ দেহের এত কাছে পরিচালকের গোটা শরীরটা ঘনিয়ে এসেছে, ওর নিশ্বাস, হৃদ্‌পিণ্ড, উত্তাপ সমস্ত কিছু জড়িয়ে পরিমল সান্যালের ব্যক্তিত্বের সমস্ত আলো নিবে গিয়ে পবিচালককে নির্বিশেষ কবে' তুলছে। এখন, এই মুহূর্তে, বলাই ঘোষ আর রামানন্দবাবুর সঙ্গে আলাদা করে' চেনা যায় না তাকে।

সোনারপুর স্টেশন ছাড়িয়ে যাবার পর সুইচ টিপে যখন আলো জ্বাললেন সান্যাল, সেই আলোতে ধীরে ধীরে চোখ মেলে সুভদ্রা তাকাল মানুষটির দিকে।

আর, কী আশ্চর্য, অন্ধকারের অতল সমুদ্রে যে মানুষটি হারিয়ে গিয়েছিল, তীব্র বিবমিষায় যে মানুষটির প্রতি তার সমস্ত মন সংকুচিত হয়ে উঠেছিল, প্রকাশমান আলোব উদ্ভাসে এখন সেই মানুষটিকেই আশ্চর্য-সুন্দর দেখাচ্ছে। তেমনি পরিপাটি ঢেউ সংকুল চুল, তেমনি সুদূরের মায়া-জড়ানো চোখের ধ্যানী-দৃষ্টি, ব্যক্তিত্বের জ্যোতির্মালা...অবাক-বিস্ময়ে সমস্ত অন্তর পংগু হয়ে যায় সুভদ্রার। এই মুহূর্তে চোখের সামনে এই ভালো-লাগা মানুষটিকে দেখে হঠাৎ তার চোখদুটো অকারণে অশ্রু-সজল হয়ে ওঠে। এই মানুষ একবার আকর্ষণ করে, আবার এর প্রতিই ঘৃণায় এক সময় সর্বাঙ্গ রী রী করে ওঠে সুভদ্রার। শ্রদ্ধায় স্নেহশীল পিতা, কর্তব্যনিষ্ঠায় আদর্শ স্বামী, জীবনরূপায়নে যিনি আদর্শ-সাহিত্যিক, সেই মানুষটির প্রতি অন্তহীন বিস্ময়

সুভদ্রার। আবার রাত্রির ঘন অন্ধকারে এই মানুষটিই কেমন বহুরূপীর মতো বদলে যায়, ভাবতেই কষ্ট হয় তার।

বাড়িতে ফিরে ক্লান্ত শরীরকে বিছানায় এলিয়ে দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে পুরানো কথাটাকে আবার নতুন করে' উচ্চারণ করল সুভদ্রা: 'আমি শিল্পী, শিল্পী হতে চাই··'

শরতকালের লঘু চঞ্চল মেঘগুলি কেটে গিয়ে শীতের পাণ্ডুর মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। শজনে গাছের পাতা খসল, ন্যাড়া ডালগুলি শুধু অতীতের সমৃদ্ধির এক স্বাক্ষর-স্বরূপ দাঁড়িয়ে রইল। চিমনির ধোঁয়ার, উনুনের কালিতে থকথকে পিণ্ডের মতো পুরু ধোঁয়ার আস্তরণ জমে রইল গলির আকাশে-বাতাসে। শীতকালটা এক দুঃখের ঋতু।

স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে যেদিকে শহরের কোলাহল ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে, লোকালয় গড়ে উঠেছে ছিন্নমূল পূর্ব-বাংলার মানুষগুলির, মেঠো পথ, মেঠো হাওয়া, ধানের ক্ষেত, জঙ্গল, নালা-ডোবা, হাঁটতে হাঁটতে অনেকদূর এগিয়ে চলেছে ওরা দুজন। অরূপ আর মেনকা।

অরূপ আজ কী কথা বলতে চায়। স্টুডিয়ো থেকে বেরোনোর পর অনেকক্ষণ থেকে বলবার কথাটা মনে মনে ভাঁজছিল সে। এত সহজ কথা আর সাধারণ কথা, তবু বলতে যেন জিভে সাড় নেই।

খোলা মাঠে উদ্‌ভ্রান্ত হাওয়া বইছে। শীতের পুলক। কাছে দূরে কুঁড়ে ঘরগুলি থেকে মিটিমিটি আলো, টুকরো-টুকরো কথা, হাসি, গান।

একটা সিগারেট ধরাল অরূপ। সন্ধ্যার বাতাসে ওর সিগারেটের ধোঁয়া ভেঙে-ভেঙে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে সরে-সরে যেতে লাগল। চিন্তাগুলোকে যেন প্রাণপণে গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করতে-করতে আপন মনে হাসল সে। তারপর স্পষ্ট মেনকার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে শুষ্ক গলায় বলে উঠল: 'আমি কী বলতে চাচ্ছি তা তো তুমি জানো মেনকা···'

মেনকা চমকাল না, বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হল না, কাঁপুনি ধরল না তার কণ্ঠস্বরে, না—আনন্দের, না—বিস্ময়ের। শুধু ছোট্ট করে উত্তর দিল: 'জানি।'

'তবে—?' অরূপের উৎসুক জিজ্ঞাসা।

'তা হয় না অরূপ। না না, কিছুতেই হয় না।'

অরূপ আহত গলায় বললে, 'কেন? কেন হয় না?'

'বিশ্বাস করো, তোমার পায়ে পড়ি বিশ্বাস করো, তা' কিছুতেই হয় না।' মেনকার কণ্ঠস্বরে আর্তনাদ, ক্লান্ত, বিধুর।

অরূপ আর একটা সিগারেট ধরাল। নির্বাক, চিন্তিত।

খোলা মাঠের বুকে হাওয়া যেন আরো উদ্দাম হয়ে উঠেছে। হঠাৎ শীতের হিম-হিম অনুভূতি দুজনকেই কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। দুজনে পাশাপাশি, শীতার্ত, মৌন।

অনেকক্ষণ পর ধীর গলায় অরূপ বললে, 'বুঝতে পারছি, আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না। নিজের 'পরে এ-বিশ্বাস অবশ্য আমারও নেই, আমি জানি আমি অত্যন্ত বাজে, অকেজো লোক। কিন্তু, তবু বিশ্বাস করো মেনকা: এ-প্রস্তাবের পেছনে আমার কোনো লোভ নেই, নীচতা নেই।'

মেনকা যন্ত্রণা-বিকৃত গলায় বললে, 'আমি তা' জানি, জানি অরূপ। জানি বলেই তো তোমাকে ঠকাতে চাইনে। তুমি যদি তোমার লোভ দিয়ে, তোমার নীচতা দিয়ে আমাকে চাইতে, তাহলে···তাহলে আমার পক্ষে যে কত সহজ হত···'

'মেনকা···'

'না না অরূপ:···আমি যা দিতে পেরেছি, দিয়েছি। এর বেশি আর চেয়ো না। আমি পারব না, পারব না দিতে।'

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই মেনকা। আমি ঘর চাই, আমি সংসার চাই···'

'না না ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি চুপ করো, চুপ করো—'

'মেনকা, আমার কথা শোনো, লক্ষ্মীটি···'

'না না, কোনো কথা নয়।' মেনকা ডুকরে কেঁদে উঠল: 'যদি এলে আরো আগে এলে না কেন? আজ আর আমি কী দেবো তোমাকে···?'

অরূপ বললে, 'তুমি সব দিতে পারো মেনকা, স—ব...ভাখো না চেয়ে এই পূর্ব বাংলার মানুষগুলিকে, সব খুইয়েও আবার নতুন করে মেতে উঠেছে ওরা।'

মেনকা চুপ করে' রইল। সমস্ত শরীর থেকে ঠেলে-ওঠা একটা উত্তেজনা

যেন তাকে পাগল করে' দিতে চাচ্ছে। হঠাৎ ফাঁকা মাঠের মতোই তার সারা মনটা যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে। অরূপ যেন ভিন্‌দেশী, ওর কথা, ওর আহ্বান তাকে বিন্দুমাত্র উদ্বুদ্ধ করে' তুলতে পারে না।

অনেকক্ষণ পর ওরা ফিরে চলল।

সন্ধ্যা উৎরে রাত্রি নেমেছে। শীতের কুণ্ডলীপাকানো ধোঁয়া তখন মহানগরীর আকাশ থেকে সরতে শুরু করেছে। ধবধবে রাত্রির তলায় শীতের কনকনানি জানান দিয়ে উঠেছে।

অরূপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়িতে আসার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকার ঘরে নিঃশব্দে মুখ গুঁজে পড়ে রইল মেনকা। এতদূর পথহাঁটায় গা ভেঙে ক্লান্তি নেমেছে, চোখ জ্বালা করছে, তবু ঘুম নামছে না চোখের পাতায়।

তার মুখের দিকে বেদনার্ত ক্লান্ত চোখে চেয়ে থাকা অরূপের চেহারাটা ভেসে উঠছিল। ওর বিশীর্ণ মুখটা আর চোখের সেই ব্যথা ঘন দৃষ্টিটা যেন কিছুতেই ভুলতে পারছে না মেনকা। আব অরূপ যে ও রকম একটা খোলাখুলি প্রস্তাব করবে, তা তো জানাই ছিল। দিনের পর দিন মেলামেশিতে যে ঘনিষ্ঠতা স্বাভাবিক, তার চূড়ান্ত পবিণতি অবশ্যম্ভাবীরূপে ঘটেছে। এই ভয় সে অনেকদিন থেকেই করছিল, ভয় অরূপকে নয়, নিজেকেও। নিজের ভয় থেকে নিজেকেই সবাতে পারেনি, আজ যে-আগুন জ্বলে উঠেছে তাতে পুড়তে হবে দুজনকেই।

'আমি কী করব, আমি কী করতে পারি—' উত্তপ্ত মস্তিষ্কে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল সে। কাঁপা হাতে ঘরের আলোটা জ্বালল মেনকা। কিন্তু, আলো জ্বেলেও তো চিন্তার হাত থেকে নিস্তার নেই। ধীর হাতে পরনের শাড়িটা ছেড়ে ফেলে গুছিয়ে রাখল মেনকা, গায়ের জামার বোতামগুলো খুলে ফেলল। আট পৌড়ে শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে নিতে গিয়ে হঠাৎ সামনের প্রতিবিম্বিত আয়নার ছায়া দেখে চোখ আটকে গেল তার। মন্ত্রবৎ এক পা-এক পা করে' আয়নার কাছে এগিয়ে এল সে। আলগা শাড়িটা স্খলিত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে কটিদেশ থেকে, ঊর্ধ্বাংগের ছায়া পড়েছে আয়নার বুকে। আঁতি-পাঁতি করে' খুঁজতে লাগল ক্ষ্যাপার মতো নিজের দেহটাকে, কোথাও যদি বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা লুকিয়ে

থাকে, ফ্যালফ্যাল করে' চেয়ে রইল মেনকা, বিবর্ণ কাগজের মতো সারা মুখটা সাদা হয়ে গেছে, রুদ্ধ নিশ্বাসে সে যেন প্রতীক্ষা করছে।

তারপর বন্দী দেহটার পিঞ্জরে আটকানো ইচ্ছার পাখিটা যন্ত্রণায় ডানা ঝাপটে উঠল শরীরের মধ্যে, রক্তে যেন প্রলাপ বকতে লাগল, আর কানের পর্দায় কারা যেন অব্যক্ত চিৎকার শুরু করে' চলল, চোখে আঁধার দেখল মেনকা, মাথা ঘুরতে লাগল, হঠাৎ কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল তার শরীরটা, একটা জান্তব গোঙানি, তারপর পাষাণ ফেটে উন্মুক্ত ঝরণার মতো চোখ বেয়ে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল···

আবার দিন, আবার রাত।

আব একটা হপ্তাই ঘুরে গেল আপন গতিতে।

এ' কদিন অরূপের সঙ্গে দেখা করেনি মেনকা, এড়িয়ে চলেছে তাকে, বিছানায় শুয়ে কেঁদেছে, ভেবেছে, চুল ছিঁড়েছে। কোনো আলো খুঁজে পায় নি। অনেক ঘুমহীন রাত্রির অনেক ভাবনার মধ্যে দিয়ে এটাই স্থির বুঝল, অরূপকে প্রতারণা করার মানে নেই। সে যা তাই তাকে নির্ভুলভাবে জানিয়ে দিক। কিন্তু··তাই কি কলমে লেখা যায়? গোটা গোটা অক্ষরে ধরে-ধরে কাঁপা হাতে বহু যুগ পর কলম ধরল মেনকা। লিখল: 'মেয়ে মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ থেকে অভাগী বঞ্চিত। তুমি ঘর চেয়েছ, সংসাব চেয়েছ—কিন্তু ঘর বলতে তো চার দেয়াল আর মাথার ওপরে একটা ছাদ নয়, সংসার বলতে তো শুধু দু'মুঠো দু'বেলা ভাত বেড়ে দেওয়া নয়। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ: আমি কোনোদিন মা হতে পারব না······'

চিঠিটা ডাকে পাঠিয়ে দিয়ে যেন অনেক হাল্কা, অনেক স্বস্তি বোধ করল মেনকা। আর, এর অনিবার্য পরিণতির দিকটাও ভেবে নিতে ভুল হল না তার। যাক। জীবনের একটি পর্বের এখানেই পূর্ণচ্ছেদ।

পরদিন দুপুরে খেতে বসতে না-বসতে হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে পড়ল ছবি, দ্রুত পায়ে কলতলার দিকে ছুটে গেল। আর বারান্দা থেকেই ভেসে এল তার সরব বমির শব্দ।

মেনকাও ছুটে গেল ওকে ধরতে।

'কী খেয়েছিলি কাল রাত্রে? শরীর খারাপ হয়েছে?'

ছবি মুখ ধুতে ধুতে কোনো উত্তর দিল না। তার চোখ-দুটো কেমন আয়নার মতো চকচক করে' উঠল। হেসে বললে, 'কিছু হয়নি।'

মেনকা ফ্যাল ফ্যাল করে' চেয়ে রইল ওর দিকে।

ছবি ভিজে কাপড়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল। শুকনো কাপড়টা হাতে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। 'কিছু হয়নি।' কিছু হয়নি বলে' বেমালুম চিন্তাটাকে উড়িয়ে দিলেও তো ভাবনা যায় না। কিছু যে হয়েছে সে কথা ছবির মতো আর কে জানে!

বিকেল গড়াতে না-গড়াতে ছবি বেরিয়ে পড়ল ফলি মিস্ত্রীর খোঁজে।

সমস্ত বাড়িটা এখন নির্জন। সুভদ্রাও বেরিয়ে পড়েছে স্টুডিয়োর কাজে।

নির্জন অবসর। উঠোনে ছায়া পড়েছে বিকেলের ম্লান রোদের, কলতলার নোঙরা জল নিয়ে হুটোপুটি করছে কয়েকটা শালিক কি চড়ুই। শজনে গাছের ডালে বসা কাকটা বোধহয় তারই প্রতিবাদ করে' গুরুমশায়ের ঢঙে কয়েকবার কা-কা রবে চিৎকার করে' উঠল।

এই বিপুল নির্জনতার মধ্যে নিজের নিঃসংগ মনকে নিয়ে যে কি করবে, মেনকা বুঝতে পারে না। আমঝাড়া মাঠের আদিগন্ত শূন্যতার মতোই তার সারা মন খা-খা করছে। একটু বেড়িয়ে আসা যায়, কিন্তু কোথায় যাবে? যেখানেই যাবে, তার মনের শূন্যতা তাকে ধাওয়া করেই পিছনে চলবে।

ছবি, ছবি অমন করে' ছুটে বেরিয়ে গেল কেন? কি হয়েছে ওর? …অরূপ, অরূপ কি আজ বিকেলের ডাকেই চিঠি পেয়ে যাবে! কী ভাবছে সে চিঠি পড়ে'? রাগ, বিরক্তি, না কি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে সে মেনকার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে! অরূপ ঘর চায়, সংসার চায়! হায়রে! অরূপ ঘর চায়, ছবি ঘর চায়। ঘর—ঘর—ঘর, এত ঘর কোথায়? কলকাতায় ঘর পাওয়া যায় না, সমস্ত জীবনটা কল্‌কেতা হয়ে গেছে…ঘর, ঘর, ঘর… বিকেলের পড়ন্ত বেলা, রোদের রঙ বিবর্ণতর, হাওয়া, শজনের ডালগুলো নড়ে উঠল, ডানা ঝাপটে কাকটা উড়ে গেল, কা—কা, কা—কা নয়, খা—খা, কী খাবে?…শালিক-কি-চড়ুই, নোঙরা জলের তলায় মাথা খুঁড়ছে, অরূপ, অরূপের মুখ, চোখ, চোখের নরম শিশিরবিন্দুর মতো বেদনা, অরূপ,

সিগারেটের গন্ধ, উসকো চুল, চোয়ালের বেমানান হাড় দুটো, শিরাবহুল হাত, অরূপ, ঘর-সংসার, অরূপের মুখ, শুকনো ক্লান্ত, চোখ, চোখের বেদনা…

'কে ?' চমকে পেছন ফিরে তাকাল মেনকা।

অন্ধকার বারান্দার ওপর চুপি পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে একটি ছায়া মূর্তি।

'কে ? কে গো ?'

ছায়া মূর্তিটি নড়ে উঠল। তারপর কথা কয়ে উঠল : 'চোখের আড়াল হলেই নাকি মনের আড়াল হয় ! আমাকে চিনতে পারছিস নে ?'

'পটল !'

'তবু ভালো যে চিনতে পারলে…' পটলের গলায় অভিমান।

মেনকা এই মুহূর্তে পটলকে পেয়ে যেন বেঁচে গেল !

'আয়, আয়, কী যে বলিস পাগলের মতো ! তুই-ই তো ভুলে গেছিস আমাদের। এখান থেকে যাওয়া তো তোর মাস তিনেক হল। চ' ঘরে চ'।'

ঘরে এসে আলো জেলে পটলের দিকে ভালো করে' তাকাতেই কেমন চমকে উঠল মেনকা।

'একী, কি ছিবি হয়েছে তোর চেহাবার।' অবাক গলায় জিগ্যেস করল সে : 'কী হয়েছে, অসুখ কবেছিল, নাকি রে ?'

সত্যি, তাকানো যায় না পটলের দিকে। অমন মাথা ভরা ঘন চুল কে যেন খাবলে তুলে নিয়েছে, মাথার মাঝখানে টাক, অমন গোলগাল রসালো মুখটা শুকিয়ে গেছে, ওর দর্শনীয় গা-ভরা উপছানো স্বাস্থ্যে ভাঙনের চিমে স্রোতটুকু কিছুতেই অলক্ষিত থাকে না।

'না অসুখ কেন করবে। মেয়ে মানুষের আবার অসুখ-বিসুখ কি !' পটলের গলায় শোভা-মাসির কান্না।

অনেকক্ষণ অনেক সংযমের পর কখন যে বাঁধ ভেঙে গেল, দুজনের কেউ বুঝতে পারেনি। ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে একজন নির্বাক শ্রোতা, অন্যজন বক্তা। থেমে-থেমে আত্মকাহিনীর পৃষ্ঠাগুলি আওড়ে যাচ্ছে পটল। দিলসুখ তাকে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-এর ফ্ল্যাটে আশ্রয় দিয়েছিল ঠিকই। রাণীর হালেই রেখেছিল কদিন। তারপর দিলসুখ তাকে লাগিয়ে দিল রেস্টুরেন্টের কাজে—বেয়ারার কাজ, খদ্দেরদের দেখাশোনা, সেজেগুজে নিজেকেও অমনি দেখানো। দিলসুখ বলত : লছমী, তুমি আমার সাক্ষাৎ

লছমী আছ। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত রেস্টুরেন্ট গার্লের অভিনয়। রাত্রি দশটা-এগারোটায় ছুটি, বিশ্রাম। কিন্তু সে-বিশ্রামও জুটত না তার। ঘুমোবার ক্লান্ত সময়টুকুতে দিলসুখ এসে শয্যার ভাগ নিত। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এইভাবেই চলছিল। কিন্তু…মাস ফুরুতে না ফুরুতেই দিলসুখের দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব—সব পাল্‌টে গেল। তারপর একদিন রাত্রে দিলসুখ আর এলো না, এলো অন্য লোক। চমকে চেয়ে দেখল পটল, হোটেলেরই একজন নিশাচর কাস্টমার। এর পর রাত্রির স্বাদ, চেহারা, সব কিছুই পাল্‌টে গেল। দিলসুখকে জয় করতে এসে, পটল নিজেই যেন খাদ্য হয়ে গেল ওর।

একসঙ্গে এত কথা বলে হাঁফাতে লাগল পটল। একটু হেসে দাঁত বার করে' বললে, 'আজকাল দম পাইনে একটুও, বেশীক্ষণ কথা বললে কাশি পায়।

মেনকা বললে, 'তাহলে আর কথা বলে কাজ নেই। একটু চুপ কর।'

'একটু খাবার জল দে—না না গ্লাসে নয়, ঘটিতেই দে—আমার অসুখটা আবার ভালো নয় কিনা।' ম্লান হাসল পটল।

'অসুখ! তবে যে বললি অসুখ করে নি?'

'তুই যেমন বোকা! এ লাইনে অসুখ নেই কার! আর নচ্ছার পুরুষগুলো এক একটা রোগের ডিপো। কৃমি, কৃমির কীট। একমাস পোয়াতে না পোয়াতেই মালুম পেলাম, পোকা ধরল শরীরে, প্রথমে তলপেটে যন্ত্রণা, ব্যথা, তারপর ব্যথাটা চারিয়ে গেল সাপের বিষের মতো সর্বদেহে। মাথা ঘোরা, বমি বমি, খিদেয় অনিচ্ছে, বুক ধড়ফড়…তবু বিশ্রাম পাইনি, জিরোতে পারিনি, ব্যথা চেপে দাঁতে দাঁত এঁটে চোখের জলকে রোধ করেছি, পয়লা খদ্দের চলে গেলে উঠে গিয়ে বাথরুমে মুখ চোখ শরীর ধুয়ে এসেছি, আবার পাউডার ঘসেছি, সেণ্ট ঢেলেছি, দ্বিতীয় খদ্দেরের জন্যে মুহূর্ত গণেছি।.. কিন্তু, কী হল ভাই, কী করব আমি, আজ আমার সারা শরীরে বিচ্ছিরি কুচ্ছিত পারা-ঘা ফুটে বেরিয়েছে…'

মেনকা কিছুক্ষণ চুপ করে' থেকে পরে বললে, 'এই যখন অবস্থা, চলে এলি নি কেন?'

'চলে আসব কি করে' ভাই? বাঘের গহ্বর। একবার সেঁধোলে বেরোনোর ফন্দি-ফিকির নেই। আর তাছাড়া—'দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললে পটল: 'যা ক্ষতি হবার তাতো তখন হয়েই গেছে।'

সন্ধ্যা ঘন হয়ে নেমেছে। হাওয়া দিচ্ছে এলোমেলো।

নির্জন ঘরে এই দুটি প্রাণী আরো নির্জন হয়ে উঠেছে। মূক, নিথর। এই নিঃশব্দতা যেন তাদের মৃত সন্তান, কোলে নিয়ে পাষাণের মতো অকম্প দুজনে।

মেনকা মৃদু গলায় বললে, 'ডাক্তার দেখাস নি?'

পটল ম্লান হেসে বললে, 'কি হবে দেখিয়ে? সারিয়ে তুলতে-তুলতে আবার তো নতুন করে' অসুখ বাঁধবে।...'

মেনকা বললে, 'চলে আয় ওখান থেকে। ওখানে থাকলে যে তুই মরবি।'

'মরতে আর বাকি কি আছে, ভাই। ওখান থেকে চলে এলেও তো মরার হাত থেকে বাঁচব না।' তারপর হাত দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'এই পেট, এ যে বিষম জ্বালা, খেতে দেবে কে, তুই দিবি?'

মেনকা চুপ করে' রইল।

পটল বললে, 'আমি মরতে ভয় পাই নে। কিন্তু মরবার আগে আমার শত্তুরদের ব্যবস্থা যদি না করে' যাই, তবে নরকে গিয়েও শাস্তি পাব না।... এখনো অনেক কাজ বাকি। দিলসুখের চৌকশ ছেলে প্রেম, দু' একদিনের মধ্যেই ওকে নাগালে পাব, আর আমার দেহের সঙ্গে আমার বিষাক্ত ঘা ছড়িয়ে দেবো ওর রক্তে।' চোখের তারা দুটো জ্বলে উঠল পটলের: 'বাপের অপরাধের প্রাচ্ছিত্তির ছেলেকেই করে' যেতে হবে...'

মেনকা নীরবে ওর কথা শুনতে লাগল।

'বুড়ো শকুনটা আরো কি বলে জানিস?' উঠতে উঠতে বললে পটল: 'বলে, তোমাদের ওখানে তো আরো মেয়েরা রয়েছে, ওদের বলো না আমার ফ্ল্যাটে উঠে আসতে। খেতে পাবে, পরতে পাবে—'

'তুই কি জবাব দিলি?' মেনকা জিগ্যেস করল এবার।

'বললাম: পটল নিজে পুড়তে পারে, মরতে পারে, কিন্তু তাকে দিয়ে টোপের কাজ করানো চলবে না।...আর নয়, এবার চলি ভাই। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে—'

'বালাই ষাট। কি যে বলিস অলুক্ষণে কথা। মরবি কেন...'

'না না, মরব কেন! আমি বাঁচব, নিশ্চয় বাঁচব—' হয়তো একটা মরীয়া কান্না চাপতে-চাপতেই ছুটে বেরিয়ে গেল পটল।

রাত্রি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। দূর থেকে নাগরিক কোলাহল—যন্ত্র আর মানুষের যুগ্ম অস্তিত্বের ঘোষণা। গলির নির্জনতা চিরে একটা রিকশা শব্দের নুপুর বাজিয়ে দূরে অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল। কোথা থেকে একটা শিশুর কান্না, চিৎকার, গালাগালি, নারীকণ্ঠের আনুনাসিক ঝংকার।

জানালার গরাদ ধরে বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে মেনকা। এক আকাশ তারা। শীতের কুয়াশার আবরণটুকু আজ পাত্‌লা। অরূপ, অরূপের মুখ, পটল···ছবি এখনো দেরি করছে কেন ফিরতে! পটল, ছবি···অরূপ, অরূপের ব্যথাভরা চোখের দৃষ্টি, ঘর, সংসার, এতক্ষণে তার চিঠি কি পেয়েছে সে। ছবি, ছবির কী শরীর খারাপ, ছুটতে-ছুটতে ও কোথায় গেল, ফলি মিস্ত্রী, ঘর সংসার, পটল, পটল কাঁদছে, অরূপ, অরূপ নিশ্চয় এতক্ষণে হেসে উঠেছে ওর চিঠি পড়ে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে, কিন্তু, মেনকা কী করবে, এবার কী করবে, দিলসুখ, দিলসুখ বলেছে মেয়েদের ওর ফ্ল্যাটে নিয়ে আসতে, খাওয়া পরা, আর দেহ দাও, উষর, নিষ্ফলা মরুর মতো দেহ, বাঁচো-বাঁচো-বাঁচো, অরূপ, না, শোভামাসি কোথায় এখন, বিন্দু, বিন্দুরে, কে এল? সুভদ্রা দি', সুভদ্রাদি স্টুডিয়োয় কাজ পেয়েছে, ভীষণ খাটছে, গুণ্‌ গুণ করে গান গাইছে সুভদ্রাদি', এক আকাশ তারা জ্বলজ্বল করছে, শীত-শীত, তেষ্টা, জল, না, ছবি, ছবি এখনো এল না, অরূপের মুখ, পটল, না, জল, জল খাবে সে, কোথাও বৃষ্টি পড়ছে, লোনা-লোনা, মাতলা দুলছে, সামাল-সামাল মাঝি, এপারে ক্যানিংগঞ্জ, জামাইবাবু, দিদি, কোথায় বৃষ্টি হচ্ছে, লোনা লোনা, চোখের জল লোনা কেন? অরূপ, ছবি, পটল, অরূপ, অরূপ···

সেদিন রাত্রে ছবি ফিরল না।

তারপরের দিনও নয়।

ফিরল তারপর দিন রাত্রি করে'। উসকো খুসকো চুল, খিদেয়, না, নানা-ভাবে কালো শুকনো মুখ অত্যন্ত ক্লান্ত আর নির্জীব-নির্জীব। বাড়িতে ফিরে মেনকাকে ডাকবারও প্রয়োজন বোধ করেনি, ভেবেছিলো নিঃশব্দে দরজা খুলে ঘরে ঢুকে রাত কাবার করে' দেবে।

কিন্তু, তা হলে না। ওর দরজা খোলার শব্দে মেনকা ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'কোথায় ছিলি এই দু'দিন, হাঁ রে ?'

'জাহান্নামে।' বললে গম্ভীর হয়ে ছবি।

'কী বকছিস যা তা ? বল্ না, কোথায় গিয়েছিলি ?'

'কাজিপাড়া—বারাসাতে। ওখানে ফলি মিস্ত্রির বাড়ি।' বললে থেমে-থেমে ছবি: 'ফলি মিস্ত্রিকে তো পেলাম না, দেখলাম ওর দু' দুটো বিবিকে, আর এক গণ্ডা বাচ্চাকে। মুখ শুকিয়েছিল আগেই, এবার বুক শুকোল। দু' দুটো জলজ্যান্ত বিবি ঘরে একথা কোনোদিন আমাকে ফলি বলেনি। কিন্তু, কী করব বল্, আমার ছেলে, আমার পেটের ছেলে তার বাবাকে জানবে না। এ হতেই পারে না।, আমি আমার মা'র ভাগ্যকে ফিরিয়ে আনতে চাইনে।...'

'তোর ছেলে, তোর পেটের ছেলে, কী বলছিস যা তা ?'

'যা তা নয় ভাই, সত্যি, সত্যি মেনকা ! ফলির ছেলে আমার পেটে।'

'ফলির ছেলে !'

'হ্যাঁ ভাই। অথচ এত সাবধান ছিলাম, এত সতর্ক ছিলাম, তবু, তবু পারলাম না তো। বলতে পারিস ভাই কেন, কেন এমন হয় ! একটা রাত্তির, সব লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেল। বলতে পারিস রাত্তিরের কী জাদু আছে ?'

মেনকা অনেকক্ষণ চুপ করে' থেকে বললে, 'ফলি মিস্ত্রির সঙ্গে দেখা হল ?'

'হ্যাঁ: আজ দুপুরে হয়েছে—'

'কি বললে ?'

'আমাকে বে' করতে পারবে না। দু' দুটো জোয়ান বিবি ঘাড়ে। খাওয়াবে কি !'

'তুই কি বললি ?'

'বলব কি: মাথা ঘুরছে তখন আমার, চোখে অন্ধকার দেখছি, সারাদিন খাওয়া হয়নি। বলব কি তোকে ভাই, যতদূর নীচে নামবার আমি নেমেছিলাম। বললাম, আমাকে নিকে করুক, তারপর বাচ্চাটা জন্মালে সে যদি ইচ্ছে করে আমাকে তালাক দিয়ে দিতে পারে। আপাতত আমার ছেলের একটা পরিচয় থাকা দরকার, সে যেন আমার মতো না হয়, যেন তার বাবাকে চিনতে পারে ! ...চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী ! কিছুতেই রাজি হল না। বললে, মোছলমানের বাচ্চা হয়ে অমন কাজ করতে পারবে না, কাজিগ্রামের মোল্লারা তাহলে তাকে প্রাণে না-মেরে জানে মারবে, একঘরে করবে। ও-তো হাত ঝেড়ে মাছি

তাড়াবার মতো ব্যাপারটাকে চুকিয়ে ফেলল, কিন্তু আমি কী করি এখন বল্ তো?'

রাত্রি বাড়তে লাগল। শীতের দীর্ঘ অলস রাত্রি।

অনেকক্ষণ পর যেন ঘুম ঝেড়ে মৃদু গলায় বললে মেনকা: 'কি করবি বল্, যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই। ভুল তো মানুষেরই হয়।'

ছবির চোখ দুটো জ্বলে উঠল: 'তুই কি বলতে চাস আমি এসব মেনে নেবো? দশমাস ধরে একটা পাপকে আমার গর্ভে ধারণ করব? আমার সর্বশরীর সেই থেকে ঘৃণায় রী-রী করে' উঠছে জানিস! গলায় আঙুল চালিয়ে বমি করে' যদি আপদটাকে উগ্‌লে দিতে পারতাম...'

'ছি ভাই, অমন কথা বলতে নেই! তোদের ভালোবাসা দিয়েই তো ওর জন্ম; ও তো কোনো দোষ করেনি?'

'অমন ভালোবাসার কাঁথায় আগুন—থুঃ থুঃ—মরণও নাই আমার... আমার জন্মও তো এমনি ভাবেই হয়েছিল!' তারপর ফিশফিশ করে' বললে ছবি: 'আচ্ছা মেনকা—'

'কি?'

'আমি বলছিলাম—' থেমে-থেমে বললে ছবি: 'তুই, তুইও তো এই ভাবে ফাঁড়া কাটিয়ে রক্ষা পেয়েছিলি, আমি—আমি...'

'চুপ কর, চুপ কর ছবি, সামলে কথা বলিস, বড় বাড় বেড়েছে তোর, না?' হঠাৎ উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে' উঠল মেনকা, নিজের কানেই বিশ্রী ঠেকল তার আওয়াজটা, কেমন বেসুরো কর্কশ।

মেনকার উত্তেজনার মুখে ছবি পাংশু স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। ওর মুখ দিয়ে কোনো বাক্য সরল না।

চোখের তারা দুটো ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মতো জ্বলছিল মেনকার, ধক ধক করে দ্রুতপায়ে শব্দিত হচ্ছিল হৃদ্‌পিণ্ড, অত্যন্ত বীভৎস ভয়াল-ভয়ংকর দেখাচ্ছিল ওকে। আর দাঁড়াল না মেনকা, হঠাৎ ঝড়ের মতো ছবিকে হতবাক্ করে দিয়ে ছুটে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে' দিল সে।

অনেকক্ষণ অন্ধকার ঘরের মধ্যে পাষাণের মতো দাঁড়িয়ে রইল সে। দাউ দাউ করে' আগুন জ্বলছে যেন তার সমস্ত শরীর ঘিরে, তার চোখ মুখ

বুক, আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের চূড়ান্ত উত্তেজনা, এখুনি যেন ফেটে চুরে রেণু রেণু হয়ে যাবে সে, কিন্তু না, সেই সর্বনাশী মুহূর্তের আগে চোখ ফেটে বড় বড় উত্তপ্ত অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল তার গাল বেয়ে।

উত্তেজনা শীতল হলে, সম্বিত ফিরে এলে নিজের আচরণে নিজেই লজ্জা পেল মেনকা। কোনোদিন কারুর সঙ্গে সে খারাপ ব্যবহার করেনি, কাউকে রূঢ় কথা উচ্চারণ করতে পারেনি কোনোদিন, ছবি যদি জানত, যদি বুঝত এই কয়েকটা দিন ধরে' কী অনির্বাণ যন্ত্রণার শিখায় সে তুষের আগুনের মতো পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে—ওকথা বলে' তার জীবনের কী-এক হাস্যকর-করুণ অধ্যায়েরই সে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, তাহলে নিশ্চয় সে অমন ইঙ্গিত করত না! ছবির কি দোষ, ছবি তো আর জানেনা সে বৃত্তান্ত।

অনুতপ্ত ভিজে মনে আবার দরজা খুলে বেরিয়ে এল মেনকা। কত রাত হবে—কে জানে! মাথার ওপরে তারাগুলি তেমনি জ্বলজ্বল করছে। ঊর্ধ্ববাহু শুকনো শজনে গাছটা রাত্রির পটভূমিকায় স্তব্ধ সমাহিত।

ছবির ঘরের দিকে এগিয়ে গেল মেনকা।

বন্ধ দরজা। ঘরের ভেতরটায় দুঃসহ অন্ধকার। সাড়া-শব্দহীন।

'ছবি—ছবি—'

নিঃশব্দতা।

'ছবি, অ—ছবি, দরজা খোল্ ভাই—'

নিঃশব্দতা।

'এই, এই ছবি, দরজা খোল্ লক্ষীটি—'

খুট্ করে একটা শব্দ। দরজা খুলে দিতেই অন্ধকারকে ব্যংগ করে' অস্পষ্টতার মধ্যে ছবির শরীরের ডৌল কালো ছায়ার মতো দুলে উঠল, কপাল বেয়ে উচ্ছৃংখল চুলের রাশি, অন্ধকারে প্রেতায়িত ওর চোখের দৃষ্টি, জানু পর্যন্ত টেনে-আনা সেমিজটায় আটকানো ওর দেহ, থরথর করে' হাওয়া-লাগা বেতঝাড়ের মতো কাঁপছে ওর দেহমূল, মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গিতে কি যেন বিড়-বিড় করে' বলবার চেষ্টা করছিল, তারপর হঠাৎ রাত্রিকে সচকিত করে' তার কান্নার খিন-খিনে আওয়াজ জেগে উঠল: 'কেন, কেন আমাকে ডাকলে? আমি কি করেছি তোমাদের—আমি কি শান্তিতেও মরতে পাবনা।'

চমকে উঠল মেনকা। ঘটনার সমস্ত চেহারাটা এবার পরিষ্কার হয়ে

এল তার কাছে। ঘরের তক্তপোশটা টেনে এনে ঘরের মাঝখানে কড়ি-কাঠের নিচে দাঁড় করিয়েছে ছবি, আর কড়ি-কাঠের গা থেকে ঝোলানো তার পরনের শাড়িটাই বোধহয় ওটা। সমস্ত আয়োজন ঠিক করে' ফেলেছিল ছবি, শাড়ির ফাঁসটুকু গলায় এঁটে নিতে যা-দেরি, আর তারপরই পা দিয়ে ঠেলে দিত খাড়া করা তক্তপোশটা, শূন্যে ঝুলত ওর শরীরটা, জন্ম আর মৃত্যুর কিছুক্ষণ লড়াই, তারপর বিন্দুর মতোই তার জীবন যন্ত্রণা নিঃশেষ হয়ে যেত…

'ছবি, তুই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলি!'

'হ্যাঁ—'

'ছি ভাই, আত্মহত্যা পাপ!'

'আমি নিজেই তো পাপী, আমার গায়ে আর নতুন করে' কি পাপ লাগবে?'

'বাজে কথা বলতে হবে না। বড় পাকা হয়েছিস, না? আয়, আয় আমার সঙ্গে—' হিড়-হিড় করে' ওকে টেনে নিয়ে এল মেনকা, একেবারে ওর ঘরে। ঘাড় ধরে বসিয়ে দিল ওর তক্তপোশের বুকে। 'আজ তুই আমার কাছে শুবি—'

রাত্রি কত হয়েছে, কে জানে।

ঘুম নেই চোখে দুজনের।

বিছানার একপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়ে' রয়েছে ছবি, মেনকা ওর দিকে না-তাকিয়েও বুঝতে পারে, কাঁদছে সে। অবরুদ্ধ কান্নায় গুমরে গুমরে উঠছে ওর শরীর। কাঁদুক, কেঁদে-কেঁদে ক্লান্ত হবে মন, ঠাণ্ডা হবে শরীর, তারপর জীবনটাও হয়তো অনেক সুস্থ হয়ে উঠবে তার কাছে।

কত কথা মনে পড়ে মেনকার। ছেলেবেলার কথা, বাড়ির কথা। লোনা দেশ, ছাতি-ফাটা মাটি, আর জল-কষ্ট। সেই আধ মাইল দূর থেকে সর্দারদের পানীয় জলের বাঁধানো পুকুরের জল ব'য়ে আনতে হত। 'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল' নয়, সে জল কান্নার আর অপমানের, সে পথ রাক্ষসের আর লোলুপ রসনার। শরীর বাড়ছে, ভারি হচ্ছে স্ত্রী-প্রত্যঙ্গ, আঁটোসাটো শরীরটাকে তাঁতের কাপড়ের মোড়কে কিছুতেই আর আবৃত রাখা যায় না। কলসীর জলে কাপড় ভেজে, শরীর ভেজে, ছলাৎ ছলাৎ বুকের রক্তে দোলা জাগে। তারপর আরো কত ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্নের মেঘ, পাল্কী চেপে দিদির

বর এল, শাঁখ বাজিয়ে পুরুত আর অগ্নি-সাক্ষী রেখে দিদিকে সমর্পণ করা হল, বছর ঘুরতে না-ঘুরতে দিদি এল বাপের বাড়ীতে, মৃত সন্তান মাকেও অর্ধমৃত করে' চলে গেল, দিদি শয্যাশায়ী হল গ্রহণী রোগে, আর রুগ্না দিদিকে সেবা করবার জন্যেই না যেতে হল তাকে। ছলাৎ ছলাৎ—মাতলা নদীর ঢেউ, নৌকো দুলল, ডুবল না, এপারে ক্যানিংগঞ্জ, রুগ্ন মানুষের সেবার চেয়ে সুস্থ মানুষের সেবার দাবিই যে বড়, কে জানত! আর তখন কুমারী জীবনের জড়তা ভাঙছে, সেই জড়তাকে হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে ভেঙে চুরমার করে' দিলেন জামাইবাবু। হঠাৎ-জাগা বানের টানে কুটোর মতো ভেসে গেল সে। কী আশ্চর্য, রাতারাতি সে একেবারে নিজেই দিদি হয়ে গেল। জামাইবাবুকে আর কিছুতেই পর মনে হল না। তারপর জীবনের রঙ বদলালো; রাত্রির বয়েস বাড়ল, হাসপাতালের সেই রুক্ষ বর্ণহীন দিনগুলির স্মৃতি, কাপুরুষ জামাইবাবু, আর নতুন এক জীবনের দ্বারোদ্ঘাটন···এক এক করে' কত ছবি ভাসতে লাগল মেনকার চোখের পাতায়, তারপর···তারপর, অরূপ··· অরূপ ঘর চায়, সংসার চায়, ঘর, ঘর, ঘর···

উশ-খুশ করছিল ছবি। এতক্ষণে কেঁদে কেঁদে বোধহয় শান্ত হয়েছে সে। ঘুম আসছে না ওর।

'ছবি—এই—'

'উঁ—'

'ঘুম আসছে না?'

'না—'

'জল দেবো, খাবি?'

'দাও—'

জল খেয়ে আর শুল না ছবি। জানালার গরাদ ধরে' অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

মেনকার চোখেও আজ ঘুম নেই।

দুজনের চিন্তার স্রোত ভিন্ন, কিন্তু যেখানে নির্জনতা, দুঃখবোধ সেখানে উভয়েরই মিল আছে। অবাক হয় মেনকা: জীবনের কী নির্মম পরিহাস! মা হবার জন্যে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই ছবির, মা হতে না-পাবার জন্যে ব্যথার শেষ নেই মেনকার।

'ছবি—এই'

'উঁ?'

'অত ভেবে কি হবে বল্? যা হয়েছে তাকেই স্বাভাবিক বলে' মেনে নে।'

'যদি মানতে না পারি? আর কী করে মানব, ভাই? যে জন্যে মাকে আমি সারাজীবন শাপমন্যি করে' এসেছি, আমার সন্তানও তো তেমনি আমাকে ঘৃণা করবে।'

'বেশ তো ওকে যদি কাছে না-রাখতে চাস কাউকে দান করে' দিবি; কিংবা কোনো অনাথ আশ্রমে…'

'দান করে' দেব!' ছবির গলা ভিজে-ভিজে শোনাল: 'কে নেবে এই বেজন্মা ছেলেকে, কেন নেবে?'

'নেবে—নেবে। যারা মা হতে পারেনি, মা হতে পারল না—তারাই নেবে। জীবনে আমি অনেক পোড় খেয়েছি, অনেক সয়েছি ভাই, আমি জানি জীবন কি জিনিস! সামনের বিপদ থেকে বাঁচবার জন্যে মানুষ এমন ভয়ংকর কাজ করে' ফেলে, ভাবে জীবনটা বুঝি সেখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, তার ফলে পরে জীবনে এমন সময় আসে যখন অসহায়ভাবে কপাল চাপড়ানো ছাড়া কোনো উপায় থাকে না!'

'আমি অত কথা বুঝতে চাইনে। বোঝবার দরকারও নেই আমার।' একটু দম নিয়ে বললে ছবি: 'দান করে' দেব! বললেই হল! বেশ তো তোকেই প্রশ্ন করি: নিবি, নিবি আমার ছেলেকে?…কই উত্তর দে?'

মেনকা কি-ভাবল, তারপর মৃদু স্বরে বললে, 'আমাকে পরীক্ষা করছিস?'

ছবি চুপ করে রইল।

মেনকা আবার বললে, 'হ্যাঁ। আমিই নেবো তোর ছেলেকে। কী বলে তোকে বোঝাব ছবি, এ যে কত বড় সৌভাগ্য আমার পক্ষে।'

'তুই কি বলছিস মেনকা!'

'ঠিকই বলছি ভাই। আমি মা হতে চাই, মা! আর তোর ছেলে যদি আমাকে মা বলে ডাকে, তাহলে আমিই তার মা হব! মা, মা, মা!' পবিত্র মন্ত্রের মতো মা শব্দটি বারবার উচ্চারণ করতে লাগল মেনকা।

অবাক হবার পালা এবার ছবির।

'সত্যি, সত্যি বলছিস, তুই আমার ছেলের মা হবি?'

'সে যদি আমাকে মা বলে কেন হব না!'

'কী পরিচয় দিবি তার ? কে তার বাপ যখন জানতে চাইবে ?'

মেনকা হেসে বললে, 'বলব : আমিই তোর মা বাপ।'

ছবি দ্বিগুণ বিস্ময়ে চেয়ে রইল মেনকার স্থির ভাবঋদ্ধ মুখের দিকে।

শীতের দীর্ঘ রাত্রি ক্রমশ ডিমের মতো ফ্যাকাশে হয়ে এল। অনেক অপেক্ষার, অনেক ধৈর্যের গাম্ভীর্য ভেঙে বাইরের প্রকৃতিতে জাগরণের সাড়া পড়ল। শজনে গাছের বাসা থেকে কাকের বৈতালিক, ভাঙা কল থেকে জল পড়ার অস্পষ্ট কাৎরানি, গলির রাস্তার উপর থেকে বেওয়ারীশ কুকুরের প্রতিবাদ, আরো দূর থেকে ভেসে-আসা তেল কলের সিটি, ট্রাম-বাসের চলমান মুখরতা···

সকাল এল, কয়লার ধোঁয়ায় কুয়াশায় থকথকে পিণ্ডের মতো শ্বাস-রোধকরা যন্ত্রণার সঙ্গে।

উনুনে কয়েকটা চেলা-কাঠ গুঁজে দিয়ে কেরাসিন ঢেলে আগুন জ্বালল মেনকা। চায়ের বাটিটা বসিয়ে দিয়ে ফোটার যেটুকু অপেক্ষা, চায়ের পাতা দিল, চিনি, গুঁড়ো দুধ, এনামেলের বাটি।

'নে—চা খা--' চায়ের বাটি এগিয়ে দিল মেনকা ছবির দিকে।

চা খেয়ে রয়ে-বসে বেলা হল।

চায়ের বাটি দুটো ধুতে ধুতে মেনকা বললে, 'কাল রাতে ঘুমোতে পারিস নি। এই বেলা তেল মেখে চান করে' নে। আজ আমার এখানেই খাবি তুই।'

ছবি চুপ করে' থেকে বললে, 'তুমি আমার জন্যে এত করছ কেন ?'

মেনকা হেসে বললে, 'খুব বললি যা হোক। তোর জন্যে করব না তো করব রাস্তার লোকের জন্যে। আর তাছাড়া—' মুখ টিপে বললে সে : 'তুই যে আমার সতীন হলি, হলি নে ?'

ছবি কোনো উচ্চবাচ্য করল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব চুকতে বেলা হল।

বিকেলের দিকে স্টুডিয়োতে, আজ তিনদিন পর, কাজ ছিল মেনকার। বাড়িতে রইল ছবি একা।

ফেরার পথে টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর সামনে অরূপের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হবে, কে জানত। দূর থেকেই ওকে দেখে বুক দুরুদুরু করে' উঠল মেনকার। অরূপও এগিয়ে আসছিল তার দিকে। আর কী আশ্চর্য, হাসছে সে। হাসছে,

না ব্যংগ করছে! চোখা চোখা বিদ্রূপের শরজালে এখুনি কি বিদ্ধ করবে তাকে! নাঃ পালাবার পথ নেই! অনিবার্যের মতোই সোজা এগিয়ে আসছে মানুষটা।

অরূপ বললে, 'কী ভাগ্যি! ভালোই হল দেখা হয়ে। আমি তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম!'

ব্যংগ না বিদ্রূপের এ-এক নতুন কায়দা, কে জানে। ভোঁতা বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে' শুধু তাকিয়েই রইল মেনকা।

'আরে, কথা বলছ না কেন? রাগ হয়েছে?'

বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের চমক! জমে' যেন পাথর হয়ে যাবে মেনকা। তবে কি অরূপ তার চিঠি পায় নি! নাকি ঠাট্টা, আর-এক ধরণের উদাসীন নিষ্ঠুরতা!

'নাঃ সত্যি দেখছি তুমি একেবারে ভীষণ রেগে গেছ!' একটা সিগারেট ধরাল অরূপ। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে হেসে বললে, 'তিনদিন দেখা হয়নি তাতেই এত রাগ! আরে, রাগ করবার আগে কারণটা তো শুনবে? আমার জ্যেঠিমার অসুখের খবর পেয়ে মেদিনীপুর গিয়েছিলাম, আজ দুপুরে ফিরেছি!'

মেনকা তবু দিশেহারা। সংশয়-সন্দেহে দুলছে ওর হৃদয়। অভিনয় নিপুণ অরূপের এও এক অভিনয় নয় তো! সে কি তার চিঠি পায়নি? ঠিকানা কী ভুল ছিল? মেদিনীপুর থেকে ফিরে এসেও কি চিঠিটা ওর হস্তগত হয়নি! জিগ্যেস করতেও সাহস হয় না। ভয়, না, সংকোচ, না, ওই একটি জিজ্ঞাসার উপর ওর মরণ-জীবণ নির্ভর করছে। অত শীতেও সারা শরীরে গরম বোধ করছে মেনকা, একবার পান খেয়ে যেমন হয়েছিল, কপাল থেকে আরম্ভ করে' চোখ মুখ নাকের ডগা সব যেন ঘামছে তার।

অরূপ আবার হাসল। 'নাঃ—তোমাকে নিয়ে পারা গেল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কথা হয় না। চলো—ট্রামে ওঠো। ওঠো বলছি—'

অরূপের ধমককে উপেক্ষা করবার সাধ্য মেনকার ছিল না।

ট্রাম থেকে নামল ধর্মতলায়। ওখান থেকে হেঁটে গিয়ে রেড রোডের ধারে নির্জন জায়গা দেখে বসল দুজনে।

জীবনের আর-এক সন্ধ্যা। তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনের সন্ধ্যার চেয়ে এর স্বাদ আলাদা। অন্তত, মেনকার তাই মনে হচ্ছে। কত সন্ধ্যায় এখানে

বসেছে দুজনে। সেদিনও এমন নক্ষত্র-ছিটানো আকাশ, গড়ের পাশ-ঘেঁসে চাঁদ, অজস্র হাওয়ার ফুলঝুরি। আর আজ, কাছে থাকলেও নিকটে আসা যাচ্ছে না। অরূপ আর তার মধ্যে যেন যোজন পার্থক্য।

কিন্তু, কোনো পার্থক্যের লক্ষণও কি অরূপ দেখাবে না! এত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল কেন সে, ওর জামার কলার পত্ পত্ শব্দ করে মেনকার ঘাড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, ওর ডান হাতটা হঠাৎ তার ভীরু দুর্বল হাতের মধ্যেই কি-ভাষা খুঁজতে লাগল। ওর উষ্ণ স্পর্শ, শীতের রাত্রিতে আরাম দিচ্ছে। কিন্তু, কী চায়, আর কি চায় সে! ওগো, আর আমি কি দিতে পারি তোমাকে? কি চাও, কি চাও তুমি?

আর একটা সিগারেট ধরাল অরূপ। সিগারেটের আলোকে ওর মুখটা এবার চিন্তিত দেখাল।

অরূপ বললে, 'দরকারী কথাটা বলবার জন্যেই তোমাকে ডেকে এনেছি।'

দরকারী কথা! এরপরেও দরকারী কথা কি থাকতে পারে! বুকটা ছাঁৎ করে' উঠল মেনকার। তবে কি সে তার চিঠি পায়নি!

অরূপ বললে, 'একটা যাত্রা পার্টির সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করেছি। এই শীতের সিজিনেই দল নিয়ে উত্তর বঙ্গে বেরোচ্ছে ওরা। রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, হিলি··· মফস্বলে ওদের দলের বেশ নাম আছে, দলটাও ভালো, নাম শুনে থাকবে: 'কমল অপেরা।' তিনটে বই করবে ওরা। রামপ্রসাদ, বাঙালির মা আর নরমেধযজ্ঞ। দু' একটি মেন রোলে আমাকে দেবে। ওরা বলছিল: অভিনয় করতে পারে এরকম একজন মেয়েও ওদের দরকার। আমি তোমার কথা তাদের বলেছি···'

'আমি!'

'হ্যাঁ তুমি। কেন, আপত্তি আছে? শীতের কয়েক মাস বাইরে বাইরে ঘুরতে হবে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ওদের। এ ছাড়া পার নাইট কুড়ি টাকা করে' দেবে। কেন, তোমার এই সিনেমা লাইন থেকে খারাপ কিসের?'

'কিন্তু···আমি···ইয়ে—'

অরূপ রেগে উঠে বললে, 'ত্যাখো, এই কদিনে বেশ জ্বালিয়েছ তুমি। আমি পষ্ট করে' বলছি: ওসব ইয়ে ফিয়ে আমার কাছে চলবে না।'

থতমত খেয়ে আরো স্থির হয়ে গেল মেনকা। ওর মানসিক অবস্থায় অরূপের রাগটা আরো বেমানান। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে, তাকে কোনো

কিছু বুঝতে না দিয়ে তার হাত ধরে যে কোন্‌দিকে টেনে নিয়ে চলেছে অরূপ, ভগবান জানে। চিঠির কথাও তো একবারও উল্লেখ করছে না সে। তবে কি সে চিঠি ওর হাতে পৌছয় নি। কিন্তু, চিঠি না পৌছলেও সেদিনকার সেই ব্যাপারের গভীর দাগ মুছে ফেলে দিয়ে আজ হঠাৎ কি করে' এত সহজ হতে পারছে সে। কিসের জোরে মেনকার সেদিনকার আপত্তিকে একেবারে ছেঁড়া পাতার মতো হাওয়ায় উড়িয়ে দিল সে। নাকি, চিঠি পেয়েছে সে। চিঠি পেয়েই নিষ্ঠুর অভিনেতার মতো তার সংগে অভিনয় করে' চলেছে, বাজিয়ে দেখছে তাকে।

'কিগো, কথা বলছ না কেন? কী, হল কী তোমার?' অরূপ হঠাৎ ওর ডান বাহু ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল ওকে।

ঝাঁকুনি দেয়ার জন্যেই বা যে কোনো কারণের জন্যেই হোক, অরূপকে আরো বিস্ময়ে পংগু করে দিয়ে, মেনকা হঠাৎ তার কোলের মধ্যে মাথা গুঁজে একটা প্রাণপণ কান্নার অসহ্য বেগকে প্রশমিত করতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। এতক্ষণকার জমাট অবরুদ্ধ বেদনাকে কান্নার মধ্যে মুক্ত করে' দিতে চাইল মেনকা। আর এতক্ষণ দুজনের মধ্যে নিঃশব্দে যে একটা ব্যবধান মিথ্যা পাচীলের মতো বুক উঁচু করে' দাঁড়িয়েছিল, অশ্রুজলের সহজ নিষ্পত্তির মধ্যে দিয়েই তার লয় হল। মেনকার ভাবাবেগকে থামাবার কোনো চেষ্টা না করে' কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অরূপ। তারপর নরম আঙুলে ওর মাথার চুলে, গলায় পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে মৃদু গলায় অরূপ বললে, 'এই—ওঠো। ছি, মুখ তোলো। শোনো—তোমার চিঠি আমি পেয়েছি...'

মুখ তুলবে কি, আরো লজ্জায়, আরো কান্নায় সজোরে আঁকড়ে রইল মেনকা অরূপের কোল। মাগো, সে মুখ তুলবে কি করে? মেয়ে হয়ে এ যে কি নিদারুণ লজ্জা, মেনকার মতো আর কে বুঝবে! তুমি আমার লজ্জা দূর করতে পারো, কিন্তু যে লজ্জাটা আসছে আমার নিজের অন্তঃস্থল থেকে তাকে আমি দূর করব কি করে?

অরূপ আবার ডাকল: 'এই—শোনো, মুখ তোলো লক্ষ্মীটি—'

'না—না...'

'শোনো, আমার কথা শোনো—'

'না—না...'

'শুনছ'—মেনকার অশ্রুসজল মুখটা তুলে ধরল অরূপ : 'কী বোকা তুমি। আমাকে চিনেও একথাটা সহজে বুঝতে পারো না, যেদিন তোমাকে নিকট করে' চাইলাম সেদিন কি যাচাই করতে গিয়েছি তুমি মা হতে পারবে কিনা! জানো তো আমি ব্যবসাদার নই, জীবনের কারবারে আমি একেবারে নিঃস্ব। বিশ্বাস করো মেনকা, তোমাকে চাইতে গিয়ে তোমার দেহের দিকটা আমার একটুও মনে পড়ে নি। আমি চেয়েছি তোমার মনকে, আত্মাকে, বিবেককে। দেহের জন্যে তোমার কাছে আসব কেন, দেহের বাইরেও তুমি কিছু দিতে পারবে বলেই তো তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছি…'

'না না, বড় বড় কথা বলে' আমাকে ভোলাতে চাচ্ছ। মা হওয়া ছাড়া মেয়েদের জীবনের আর বড় কামনা কী আছে! আমি কি দেবো, কি দিতে পারব তোমাকে। আমার কিছু নেই, কিছু নেই…'

'সব আছে, তোমার সব আছে। আমি বলছি তোমার জীবন ব্যর্থ হয়নি। ব্যর্থ হতে পারে না।'

আরো কিছুক্ষণ পর ওরা দুজনে যখন উঠল তখন মনের ভেতরটা অনেক হাল্‌কা অনেক সহজ হয়ে গেছে মেনকার।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে আজ আর কিছুতেই ঘুম আসছিল না মেনকার। আজো তার বিছানার একপাশে ছবি শুয়ে। একলা শুতে ওর ভয় করে। আর ওর এই অবস্থায় ভয় পাওয়াও ভালো নয়। এক সময় ঘুম ভেঙে ছবিও নিঃশব্দে জেগে উঠল। মেনকাকে উসখুস করতে দেখে জিগ্যেস করল : 'ঘুম আসছে না তোর?'

'না—'

'কেন? শরীর খারাপ করছে?'

'না—'

'তবে?'

মেনকা আরো সরে এল ছবির দিকে, ওর গলায় হাত রেখে একেবারে বুকের কাছে টেনে আনল তাকে। হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন শোনা যাচ্ছে, কানের কাছে মুখ নিয়ে কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে আদুরে গলায় বললে মেনকা : 'সত্যি, সত্যি তোর ছেলেকে আমায় দিবিরে, বল্‌না ভাই?'

ছবি অবাক গলায় বললে, 'হঠাৎ মাঝরাত্রে খেপে গেলি, কী হল তোর?

মেনকার তেমনি আদুরে গলা: 'বল্‌না ভাই, দিবি? আমি ওর মা হব। মা, মা, মা। আর—আর বাবা বলে ডাকবার মানুষও সে পাবে!'

ছবি অন্ধকারে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল মেনকার দিকে। জোয়ার-ফাঁপা নদীর ঢেউয়ের মতো সে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে তার গায়ের ওপর, হঠাৎ খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সে। মেনকার এ রূপ, এ পরিচয় ছবির কাছে নতুন। মেনকা কি প্রেমে পড়েছে? প্রেম! পুরুষের প্রেম! মুখে আগুন অমন পিরীতের।

'ছবি—' মেনকা ডাকল।

'কি বল্‌?'

'আমি—আমরা এই মাসেই চলে যাচ্ছি…'

'চলে যাচ্ছিস!' চমকে উঠল ছবি।' কোথায় যাচ্ছিস? কার সঙ্গে যাচ্ছিস?'

'অরূপকে তোর মনে পড়ে, সেই যে—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি। খুব চিনি অরূপকে। ওর সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধলি?' ছবি বললে: 'ওর তো শুনেছি চালচুলো নেই। নাকি বোষ্টমী হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবি লো?'

মেনকা হাসল। বললে, 'ও আমাকে টেনে যখন নামিয়েছে, পথে পথে না ঘুরিয়ে কি ছাড়বে ভাই?'

'মরণ আর কি!' ছবি পাশ ফিরে শুল।

'এই, এই ছবি, শোন না ভাই—'

'জ্বালাসনে। ঘুমোতে দে। তোর বাক্যি আর সারারাত ফুরোবে না।'

মেনকার আবেগকে হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করেও কিন্তু ঘুম আসে না ছবির। ওর চোখ দুটো জ্বলছিল, ওর চোখে যদি ফসফরাস থাকত তাহলে অন্ধকারকে চূর্ণ করেও ওর চোখের মণি দুটো বেড়ালের মতো জ্বলত, আর অন্ধ আক্রোশে ধারালো নখ দিয়ে নিজের সর্বাংগকেই ক্ষত বিক্ষত করত।

রাত্রি বাড়ছে।

ঘুম নেই চোখে সুভদ্রার। কয়েকদিন পরেই তার প্রথম ছবি মুক্তি প্রতীক্ষায় প্রহর গণছে। শরীরটা আজ বিশেষ ভালো নেই, কেমন জ্বর-জ্বর বোধ হচ্ছে, অথচ জ্বর নয় কেমন দুর্বলতা। অনেকদিন অসুখ থেকে ভুগে উঠলে যেমন হয়। চোখের কোলে রাতজাগা কালি কাজলের অভাব পূর্ণ করেছে, আগের চেয়ে রোগা হলেও বেশ ফর্সা হয়েছে, একটা স্বাচ্ছন্দ্য আর সাবলীলতার স্ফূর্তি সারা দেহে।

কিন্তু ব্যথায় সমস্ত মনটা চুমরে যাচ্ছে কেন! 'আমি শিল্পী হতে চাই,' শিল্পীই তো হল সে, দু' একদিন পরেই রসিক কলকাতাব দৃষ্টি তাকে প্রকাশ্যমান আলোকে চিনে নেবে, বাজিয়ে নেবে। বাজিয়ে নেবে, সেই বাজনার শব্দে কই—তার বুকের পাখোয়াজে তো কোনো রোল শোনা যাচ্ছে না! চোখ জ্বলছে, অনেক দিনের অতন্দ্র রাত্রি, স্টুডিয়োব খাটুনি জগন্নাথের রথের মতো উৎপীড়ন চালিয়েছে সাবা দেহের ওপব দিয়ে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে তাব, বাবা মার কথা, মামাবাবুব কথা তারপর বলাই ঘোষ, রামানন্দবাবু. পরিচালক সান্যাল, প্রত্যেকের মুখ একসঙ্গে বিদ্যুতের লহবীর মতো বিলসিত হয়ে উঠছে তার মনেব রাজ্যে। কিশোব বয়সে কী অবাক হয়ে দেখত শিউলিব কচিকচি পাতাগুলো—চিকন, পেলব, গাল বুলোনোর আনন্দ, তারপর কেমন কবে' সেই পাতাগুলোই বিশ্রী কর্কশ আব শিরাবহুল হয়ে উঠত, দাগে দাগে কলংকিত। এই দাগগুলি যেন তার মনেরই, শরীরে যাদের কোনো চিহ্ন নেই! বলাই ঘোব, রামানন্দবাবু, পরিচালক সান্যাল তাদেব কোনো দাগ আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না তার ধোয়ামাজা শরীরের মধ্যে।

'শিল্পী হওয়ার তৃতীয় পাঠ—' বাঁকা হাসি টেনে বলত ছবি।

আর পরিচালক সান্যাল কবিত্ব করে' বলতেন, 'শিল্পের জন্ম পাঁক থেকে, সে পঙ্কজা, পদ্ম। মনকে তুলে রাখো স্থূল জগতের ঊর্ধ্বে, শিল্পের সূর্য-কিরণের দিকে অনিমেষ তাকিয়ে থেকে পান করো তার বিচ্ছুরিত অগ্নিমদ।'

জীবনের তিনভাগই তো ক্লেদ আর গ্লানি, সেই পঙ্ককুণ্ড থেকে ঝির-ঝির যে টুকু জলের দাক্ষিণ্য তাতে পিপাসা মেটেনা। ডাল্টনগঞ্জের দৌড়-ঝাঁপ-করা মেয়ে জীবনের প্রতি অন্ধিসন্ধি যেন দাম দিয়ে জেনেছে। আর, কে না জানে, জানতে হলে দাম দিতেই হবে। দাম দিতে হয়েছে শরীরের

দেওয়ালী জেলে, উৎসবরাত্রির আয়োজনের মতেই তার অস্তিত্ব ছিল ক্ষণস্থায়ী। এ যেন এক তান্ত্রিক সাধনা, তার দেহকে ঘিরে এযুগের কাপালিকরা তাদের বামাচার' শেষ করেছে। আশ্চর্য এই শরীরটা, কবে সে কোন্ মুকুলিত কৈশোরে হঠাৎ এই দেহের ছোট্ট শিখাটাকে লোমশ হাতে উসকে দিয়েছিলেন মামাবাবু, সে-জাগরণে ঘুম ভাঙা বিরক্তি ছিল ক্লান্তি ছিল, আর ছিল বিস্ময়। সে বিস্ময়ের ভাণ্ড শতদলের পাপড়ির মত একটি একটি করে' উন্মোচিত হল বলাই ঘোষের করস্পর্শে, রামানন্দবাবু, আর সান্যাল সাহেবের কল্যাণে। কী হল তারপর? তারপর আর কিছু নেই। আর-এক নতুন অধ্যায়। নতুন জন্ম, নতুন চেতনা। আটপৌড়ে জীবনের খোলস বদলে পোশাকী জীবনের আভিজাত্যে সুভদ্রা আজ স্থিতধী। শিল্পের আগুন জ্বলে উঠেছে তার সারা চিত্তলোকে, সে-আগুনের আভায় সবকিছু জ্যোতির্ময় হয়ে পড়েছে। সুভদ্রা আজ শিল্পী। সারা কলকাতা ইতিমধ্যেই তাকে চিনতে শুরু করেছে। রঙ-বেরঙের পোস্টারে পোস্টারে শহর ছেয়ে গেছে। সৌরমণ্ডলের আর-এক নতুন নক্ষত্র। রোহিণী নয় বিশাখা নয়, সুভদ্রা যার নাম।

কিন্তু, কত রাত হল! আজ আর কি ঘুম আসবে না? তন্দ্রা আর জাগরণ, চৈতন্য-অচৈতন্যর পাকে জড়িয়ে যাচ্ছে অস্তিত্ব, অনুরাগ আর বিরক্তি, বৈরাগ্য আর আসক্তি···জীবন সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়েছে। আনন্দ কই, যে আনন্দের তরঙ্গে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, আনন্দের প্রকাশই বোধকরি নিরানন্দের মধ্যে, কয়লা পোড়ে দগ্ধ হবার জন্যে, আগুনের আনন্দ কয়লার নয়, যারা উপভোগ করে' তাদের।

আর দু' একদিন পরেই সুভদ্রা উঠে যাচ্ছে এবাড়ি থেকে। নিউ আলিপুর রোডে। তার অর্থ: এবাড়ির জীবন শেষ।

এক হপ্তা ধরে ভীষণ তাড়াহুড়োয় কাটাল মেনকা। পরিবর্তনটা এত অলদে এসেছে যেন তার উপযুক্ত সঙ্গত করতে ব্যস্ততার প্রয়োজন ছিল! তাছাড়াও জীবনে মোড় ফিরতে চলেছে, এখন আর স্বার্থপরের মতো ভাবার যো নেই। নতুন-জাগা গরুড়ের ক্ষুধা নিয়ে যেন এই দ্বৈত-জীবনের প্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এক মুহূর্ত স্থির থাকবার ফুরসৎ নেই। কোথা থেকে এসে অরূপ ঠেলা দেবে, আর সেই ঠেলা-খেয়ে কেবল চলতেই হবে। এতদিন পরে বেঁচে-থাকার নতুন মানে খুঁজে পেয়েছে মেনকা, শিশুর মতো হাতে

খড়ি দিয়ে ক খ শুরু করতে হবে। তাছাড়া, সংসার নামক প্রয়োজনের হাঁ-টার দাবিও বেড়েছে। বিদেশ-বিভুঁয় তায় শীতকাল, গরম জামা-কাপড় কিছু কিনতে হবে, মশারি না থাকে মশারি, ছিলিতে নাকি হাতির মতো মশা, ঘুমোলে টেনে নিয়ে যায়, আর চা-জল খাবারের রেকাব-বাটিও কিছু দরকার, নিজে রান্না করলে হাঁড়িকুড়ি মেনকার যা আছে তাতেই অবশ্য কুলিয়ে যাবে।

তারপর বিদায়ের দিন ঘনিয়ে এল। রাত্রেই জিনিসপত্তর একরকম বাঁধা-ছাঁদা করে' গিয়েছিল অরূপ। সকালের দিকে ট্রেন, ভোর-ভোর রিকশা করে' পৌঁছল অরূপ। ধরাধরি করে' জিনিসপত্তর তোলা হল গাড়িতে।

এবার বেরিয়ে পড়ার অপেক্ষা।

'তুমি রিকশায় গিয়ে বোসো। আমি আসছি।'

অরূপ সিগারেট ধরিয়ে চলে যেতেই দ্রুত পায়ে মেনকা ঘরে ঢুকল।

'ছবি, এই ছবি—কোথায় গেলি—'

ছবি ঘরে নেই।

কোথায় গেল সে? কলতলায়? চানের ঘরে?

'একী, ঘরে খিল দিয়ে কি করছিস? দরজা খোল।'

ছবি এদিকে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে' কি করছে।

'এই ছবি দরজা খোল্। শুনছিস, আমরা চলে যাচ্ছি।'

ঘরের বাঁ-দিকের জানালাটা ঈষৎ খোলা। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে মেনকা। ধুলো ভরতি মেঝেতে পিছন করে' বসে কি যেন খুঁজছে ছবি। পিঠ বেয়ে চুলের রাশ কোমরের তলায় লুটিয়েছে, নিস্পন্দ, নির্বাক।

মেনকা আবার ডাকল: 'ছবি, এই ছবি—দরজা খোল্—শুনছিস? আমরা যাচ্ছি।'

ছবির কানে তুলো, মুখও কেউ সিল্ দিয়ে এঁটে রেখেছে।

অরূপের তাগিদের গলা শোনা গেল: 'কই গো তাড়াতাড়ি এস, ট্রেন ফেল্ করবে যে।'

'হ্যাঁ যাই—' মেনকা আবার ফিরে ডাকল: 'এই ছবি, ছবি রে, শুনছিস, আমরা যাচ্ছি—'

আরো কিছুক্ষণ ধরে ডাকল মেনকা, ডেকে-ডেকে ক্লান্ত হল, আর ওদিকে অরূপের তাড়া।

'শুনছিস? ছেলে হলে খবর দিস। আমি আসব। যাই ভাই—'

না। কোনো কথার জবাব দেবেনা ছবি। দিতে পারবে না। মেনকা যতই ডেকে গলা ফাটিয়ে দিক ওর মুখের দিকে তাকাতে পারবে না সে। যদি তাকাত তাহলে ওর স্বার্থপরতায় নীচতায় অশ্রুমলিন মুখের দিকে চেয়ে আঁতকে উঠত মেনকা। যাক, যাক চলে মেনকা, মেনকার সামনে পথ আছে, সে, সে কোথায় যাবে?

রিকশা টুং টুং শব্দে ছুটল। গলির সর্পিল চংক্রমণ এড়িয়ে, যেখানে গলির পথটা চাপা হয়ে সমস্ত আবহাওয়াকে জাঁতি-কলে-চাপা ইঁদুরের মতো দম আটকে মেরেছে। যেখানে একদা ছয় ঘরের ছয় ঘরণী বাস করত—রং চটা সুটকেশের মতো বিবর্ণ, ফ্যাকাসে, নাম-গোত্রহীন। সব ছাড়িয়ে, রিকশা এসে পড়ল চিৎপুরের ট্রামলাইনের পথে—জনতা, যান, দোকান-পসরা, চিৎকার, কলকণ্ঠ, যাত্রার মিছিল, ফুটপাত ছাপিয়ে ব্যস্ত যাত্রীদের মিছিল ছুটে চলেছে।

'এই রিকশা রোখো—' অরূপ সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কিনল। আবার রিকশা ছুটে চলল শেয়ালদা' স্টেশন লক্ষ্য করে।

মেনকা স্তব্ধ নির্বাক বসে রয়েছে। তার মস্তিষ্ক কেবল কোলাহল করে চলেছে, একসংগে কত মুখ, কত চিৎকার, মনে পড়ছে—শোভামাসি, বিন্দু, পটল, ছবি—ছবি কেন কথা কইল না তার সঙ্গে, সুভদ্রা, সুভদ্রাদি—

আরে, বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে সিনেমার ওই রঙিন পোস্টারটা। আশ্চর্য! এতদিন চোখে পড়েনি! সুভদ্রাদির মুখ, হুবহু, অবিকল, হ্যাঁ হ্যাঁ, সুভদ্রাদিই তো! সুভদ্রাদি' তারকা হয়েছে!

একটি তারকার জন্ম হল! অনেক—অনেক জোনাকিজন্মের ফলভোগ করে নতুন তারকার উদয়! রাস্তার মোড়ে মোড়ে, গ্যাস পোষ্টের গায়ে, দেয়ালে-দেয়ালে, রাস্তার স্নানাগারের গায়ে, কেবল সুভদ্রার মুখ, সুভদ্রা, সুভদ্রা, সুভদ্রা…

'কি ভাবছ?' অরূপ ঠেলা দিয়ে জানাল।

'এ্যাঁ! না—' হাসল মেনকা: 'কলকাতাকে দেখছি। একদিন এই পথ দিয়েই এসেছিলাম কিনা!'

'তাই কি?'

'তাই কলকাতাকে ভালো করে' একবার দেখে নিচ্ছি। দেখেছ: কি

সুন্দর ওই পোষ্টারটা, নতুন মুখ, নতুন তারকা…আর—'মৃদুস্বরে বললে মেনকা : 'আমাদের জোনাকি-জনম থেকে মুক্তি হল না। আমরা জোনাকির আলো…'

মেনকার ওই অদ্ভুত মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিত ভঙ্গীতে চুপ করে রইল অরূপ, তারপর হাতের সিগারেটে টান দিয়ে জোর গলায় চিৎকার করে উঠল : 'এই রিকশা, জোরে চলো। জল্‌দি। আর সময় নেই—'

